একটি যন্ত্রকৌশল সংসদ প্রকাশনা

অযান্ত্রিক

একটি যন্ত্রকৌশল সংসদ প্রকাশনা
প্রকাশকাল : ২১ শে এপ্রিল, ২০০৬

সম্পাদনা পরিবার

মোঃ নূর-এ-আলম রাজন	# ০২১০১০৯
জাহিদ হোসেন	# ০২১০০৮০
হুসাইন মোঃ আব্দুল বাসেত	# ০২১০১৩১
শাফায়েত খুরশীদ	# ০২১০০৯২
কাজী আমিনুল ইসলাম রাজু	# ০২১০১০২
আহম্মেদ মারুফ ইকবাল	# ০২১০১০০
জয়দীপ সাহা	# ০২১০১৩৪
মোঃ মাহফুজুল হক জুয়েল	# ০২১০০৯৭
রিয়াজ মহিউদ্দিন	# ০২১০০২২
শামসুল আরেফীন	# ০২১০০৩৮
মোঃ রেজাউল করিম রানা	# ০২১০০৫০

অলংকরণ

নুসায়ের হাসান	#০২১০০৪৯
রাজন	# ০২১০১০৯
জাহিদ	# ০২১০০৮০
বাসেত	২১০১৩১

প্রচ্ছদ

নুসায়ের	# ০২১০০৪৯

বিশেষ ধন্যবাদ

কাজী রুবাইয়াত হাবীব	# ০২০৫০৬৮

গ্রাফিক্স

চিত্তরঞ্জন দেব নাথ
তপন চন্দ্র ভৌমিক

ডিটিপি

টেকনোলজি টুডে ডিজাইন স্টুডিও
৩৩৩/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

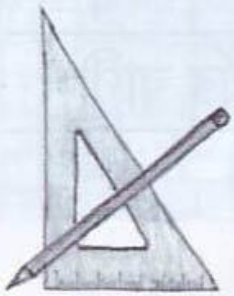

সম্পাদকীয়

যান্ত্রিকতার তুর্কি নাচন কে পাশ কাটিয়ে মেকানিক্যাল ফেস্টিভ্যাল '০৬ উপলক্ষে 'অযান্ত্রিক' প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। যন্ত্রকৌশল সংসদের মুখপত্র হিসাবে শুরু হওয়া এ ম্যাগাজিন সময়ের সাথে সাথে সফলভাবে পরিব্যাপ্তি লাভ করেছে। ম্যাগাজিনটির ১৬ বছরের ইতিহাসে বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে গিয়ে কখনও গতিশীল, কখনও বা স্তিমিত সময় পার করলেও এর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত আশাবাদী।

ধোঁয়াটে এই বর্তমানের প্রেক্ষিতে আমাদের আটপৌরে জীবনটাকে একটি মানদন্ডের সামনে দাঁড় করাতে চাই আমরা। চাই বোধের আলোয় নিজেদের চিনতে, জানতে আমাদের অন্তরের গহীনে প্রোথিত করতে ? আত্মচিন্তার পাশাপাশি কি কখনো মননশীলতা ও হানা দেয় আমাদের একান্ত অবসরে ? আত্মানুসন্ধানের পাশাপাশি আমরা এই সময়টার একটা সুস্পষ্ট ছবি এঁকে যেতে চাই। দেখতে চাই অগ্রজদের জ্বেলে যাওয়া আলোকবর্তিকাটির স্বতঃস্ফূর্ত পদচারণা। আর অনুজদের এবং আসছে দিনের অতিথিদের জন্য রেখে যেতে চাই আমাদের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ গাঁথা, আমাদের প্রাপ্তিসমূহ কিংবা হারানোর বেদনাদগ্ধ হৃদয়ের গল্প।

স্বল্প সময়ের আহ্বানে ছাত্র-ছাত্রীদের বিপুল সাড়া পেয়ে আমরা অভিভূত। কিন্তু সার্বিক পরিস্থিতি, স্থান সংকুলানের অভাবে অনেক যোগ্য লেখাও প্রকাশিত হয়নি। 'অযান্ত্রিকে'র পরবর্তী সংস্করণগুলোতে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে আশা রাখি। 'অযান্ত্রিকে'র নেপথ্যে যাদের নির্ঘুম শ্রম, বুদ্ধিদীপ্ত পরমার্শ এবং সঠিক দিক নির্দেশনা রয়েছে তাদেরকে 'শুকনো ধন্যবাদ' দিয়ে ছোট করার ধৃষ্টতা আমাদের নেই।

যাদের জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা তাদের সন্তুষ্টিই আমাদের সার্থকতা।

মাননীয় উপাচার্যের বাণী

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, যন্ত্রকৌশল সংসদ প্রতিবারের মতো যন্ত্রকৌশল বিভাগের বার্ষিক অনুষ্ঠান 'Mechanical Festival-'06' উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং খেলাধুলার আয়োজন করতে যাচ্ছে। আমি আরো আনন্দিত যে, যন্ত্রকৌশল সংসদ এ উপলক্ষ্যে একটি মনোজ্ঞ ম্যাগাজিন 'অযান্ত্রিক' বের করতে যাচ্ছে। এই ম্যাগাজিনের ছাত্র-ছাত্রীদের মননশীল চিন্তা ভাবনার কিছুটা প্রকাশ ঘটবে বলে আশা রাখি। আরো আনন্দের বিষয় যে, অনুষ্ঠানে ছাত্রদের নিজস্ব কারিগরী জ্ঞান-এর পাশাপাশি তাদের সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতা নিদর্শনও স্থান পাচ্ছে।

আজ যারা দেশ গড়ার মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক সুন্দরভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজনে সহায়তা করেছে তাদেরকে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জানাই এবং অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।

১২/৪/০৬

অধ্যাপক ডঃ মোঃ আলী মূর্তাজা
উপাচার্য
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রকল্যাণ পরিচালকের বাণী

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় যন্ত্রকৌশল সংসদ কর্তৃক মেকানিক্যাল ফেস্টিভ্যালের আয়োজন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ উপলক্ষ্যে যন্ত্রকৌশল সংসদ একটি মনোজ্ঞ ম্যাগাজিন 'অযান্ত্রিক' বের করার উদ্যোগ নিয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের কঠিন পাঠচক্রের পাশাপাশি এ ধরনের উদ্যোগ তাদের মনে বন্ধুত্বের বন্ধন সৃষ্টি করবে এবং তাদের স্মৃতিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। এ আয়োজন ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক বিকাশের পথ উন্মুক্ত করার সাথে সাথে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে সহায়ক হবে।

এই অনুষ্ঠান সাফল্যমন্ডিত করতে যারা নেপথ্য কুশীলব তাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও পূর্ণ সহযোগিতা।

প্রফেসর ড. মো. মনোয়ার হোসেন
ছাত্রকল্যাণ পরিচালক
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

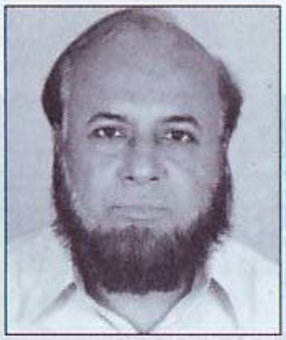

ডীনের বাণী

যন্ত্রকৌশল অনুষদের বিভাগুলির মধ্যে যন্ত্রকৌশল বিভাগ অন্যতম। এই বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী সম্মিলনে গঠিত যন্ত্রকৌশল সংসদ একটি বার্ষিক স্মরণিকা বের করার উদ্যোগ নিয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বিভাগের কঠিন পাঠচক্রের বাইরে ছাত্র-ছাত্রীদের এধরণের উদ্যোগ নি:সন্দেহে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, বন্ধুত্বের বন্ধন ও চিন্তাচেতনার বহি:প্রকাশ ঘটাবে এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়ক হবে। তাদের এ আয়োজন সার্থক হোক, সুন্দর হোক এই কামনা করছি।

অধ্যাপক ডঃ গাজী মোঃ খলিল
ডীন
যন্ত্রকৌশল অনুষদ

বিভাগীয় প্রধানের বাণী

বর্তমান সভ্যতা বিকাশের সূত্রপাত শিল্প বিপ্লব থেকেই। এ শিল্প বিপ্লবের অনেকটাই করেছেন যান্ত্রিক প্রকৌশলীগণ। তোমরা তারই একাংশ। দেশ ও সমাজ গঠনে যান্ত্রিক প্রকৌশলীদের ভূমিকা অপরিসীম। তোমরা সুস্থ্য, সৎ ও নির্ভীক হয়ে গড়ে উঠবে এ কামনা করি। নিজের জন্য কাজের সাথে সাথে সামাজিক দায়বদ্ধতা তোমাদের মনে থাকবে এই আশা করি।

যন্ত্রকৌশল সংসদের মাধ্যমে যন্ত্রকৌশল বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠবে। এরই সাথে সাথে শিক্ষকদের সাথেও তোমাদের যোগাযোগ ও বাঁধন দৃঢ় হবে সে বিশ্বাস করছি। তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম অর্জনে সহায়ক হবে। সাথে সাথে যন্ত্রকৌশল বিভাগের সুনাম অর্জনে সহায়ক হবে এই আশা ও কামনা করি।

এই সংসদের সকল কার্যক্রম যারা সাহায্য করেছে তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই কার্যক্রমে সকলের সাফল্য কামনা করছি।

অধ্যাপক মোঃ মাকসুদ হেলালী
বিভাগীয় প্রধান
যন্ত্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের বাণী

দীর্ঘ কয়েক বছরের বিরতির পর যন্ত্রকৌশল সংসদের বার্ষিক স্মরণীকা 'অযান্ত্রিক' আবার তার যাত্রা শুরু করায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। যন্ত্রকৌশল সংসদের বার্ষিক অনুষ্ঠান 'মেকানিক্যাল ফেস্টিভ্যাল ২০০৬'-এর প্রাক্কালে 'অযান্ত্রিক'-এর পুনার্বিভাব আশা করি আমাদের সবাইকে উজ্জীবিত করবে। এই স্মরণীকা যন্ত্রকৌশল সংসদের আগামী দিনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে এবং বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষকদের মাঝের ঐতিহ্যবাহী সম্পর্কের সেতুবন্ধনকে সুদৃঢ় করতে ভূমিকা রাখবে–এ প্রত্যাশা সকলের।

লেখাপাড়ার পাশাপাশি 'মেকানিক্যাল ফেস্টিভ্যাল ২০০৬'-এর আয়োজন ও 'অযান্ত্রিক'-এর পুনঃ প্রকাশের মতো কার্যক্রম বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন, সংগঠিত ও মননশীল প্রকৌশলী হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে বলে আমার বিশ্বাস। যেসব ছাত্র-শিক্ষকের কঠোর পরিশ্রমে এ প্রচেষ্টা সফল হলো তাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। যেসব প্রতিষ্ঠান এ কার্যক্রমে তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

Md Ehsan

ডঃ মোঃ এহসান
ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক
যন্ত্রকৌশল সংসদ এবং অধ্যাপক যন্ত্রকৌশল বিভাগ

মেকানিক্যাল ফেস্টিভ্যাল '০৬

অনুষ্ঠান সূচী

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও টক-শো	৯ : ১৫ মি.
ক্রীড়ানুষ্ঠান	১০ : ৩০ মি.
মধ্যাহ্ন ভোজ	১২ : ৩০ মি.
টেলিফিল্ম ও অ্যানিমেশন শো	৩ : ০০ মি.
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কনসার্ট	৬ : ৩০ মি.

শ্রেণী প্রতিনিধিবৃন্দ

কাজী মোঃ ইসমাঈল মূর্তাজা
০০১০০১৭

মির্জা ফয়সাল আহমেদ
০০১০০৬৭

ফারাহ নওশীন আবেদীন
০০১০০৭১

ইফতেখারুল ইসলাম
০০১০০৮৪

মোঃ রাসেদুল ইসলাম
০০১০০৯২

যোহেব রহমান শাওন
০১১০০২৩

সাগর আলম
০১১০০৫৪

নাতিস জাদ শফিক
০১১০০৮২

মোঃ নাজমুল হুদা
০১১০০৯৬

রিয়াজ মহিউদ্দিন
০২১০০২২

মির্জা মুহাইমেন ইকবাল
০২১০০৩৪

শাফায়েত খুরশীদ
০২১০০৯২

কাজী আমিনুল ইসলাম
০২১০১০২

যাহ্‌রা মারিয়া
০৩১০০০১

চৌধুরী মাহবুব আশরাফ
০৩১০০১৭

মোহাম্মদ তানভীর ইসলাম
০৩১০০৮৬

শ্রেণী প্রতিনিধিবৃন্দ

মোহাম্মদ আবু তৈয়ব
০৩১০১১৪

ইফতেখার আজিজ
০৪১০০১৪

মাহমুদুল হাসান সজীব
০৪১০০৫৬

অভি বিশ্বাস
০৪১০১০৭

কাজী তেহজীব
০৪১০১০৯

সৈয়দ আশরাফ আলী
০৫১০০১২

সালমান চৌধুরী
০৫১০০৫৭

মোঃ ইয়াসিন ভূঁইয়া
০৫১০০৮৫

শাহ মোহাম্মদ ইমতিয়াজ
০৫১০১২৭

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, বুয়েট প্রেক্ষিতে

ডঃ দীপক কান্তি দাশ

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক নিয়ে আজকাল খুব কথা হচ্ছে। কথা হচ্ছে বললে কম বলা হয়, বুয়েটের ছাত্রছাত্রীদের কাছে এ' বিষয়টি এখন শিক্ষকদের বিরুদ্ধে(!) একটি অনুযোগ এবং ক্ষেত্র বিশেষে অভিযোগও বটে। কয়েকদিন আগে কিছু ছাত্র আমার কাছে এসেছিল বুয়েটের সার্বিক একাডেমিক বিষয়ে কথা বলার জন্য। কথা বলে মনে হলো, তারা আরো অনেকের কাছে গিয়েছিলো। ছেলেগুলো বেশ বুদ্ধিমান, চৌকোশ ও সপ্রতিভ। তাদের কথার বেশীরভাগ জুড়েই ছিল ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক। শিক্ষকদের আচার আচরণ, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষসূচী তথা সিলেবাস ইত্যাদি অনেক কথাই বললো, মনে হলো তৈরী হয়েই এসেছিল। তাদের মতে বুয়েটে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ভাল নয়, অনেক শিক্ষকের শিক্ষাদান পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন উত্থাপন করলো, শিক্ষাসূচী নিয়েও মন্তব্য করার প্রয়াস পেল। আমি চেষ্টা করেছি, তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে। তাদের কিছু কিছু যুক্তি আমার কাছে গ্রহনযোগ্য মনে হয়েছে। আবার অনেক কিছুর সাথে একমত হতে পাচ্ছিলাম না। জানতে চাইলাম, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক বলতে তারা কি বোঝায়, সে সম্পর্ক এখন কেমন। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক বলতে তারা কি বোঝতে চাইল তা আমার কাছে পরিস্কার হয়নি, তবে এটুকু বুঝলাম যে সে সম্পর্কের ব্যাপক উন্নতি তাদের কাম্য। যে সম্পর্কের অবয়ব সম্বন্ধে ধারনা স্পষ্ট নয়, তার তথাকথিত উন্নয়ন সাধন আরও কঠিন নয় কি! অনেক বছর আগে কিছু ছাত্রনেতার সাথে অনুরূপ আলাপ হচ্ছিল। গতানুগতিক ভাষায় তারা বলে চলেছিল, শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার। কি করতে হবে! এই শিক্ষাকে গণমানুষের শিক্ষায় পরিণত করতে হবে, গণমুখী করতে হবে। শিক্ষা তো গণমুখীই, এটাকে নূতন কিভাবে কি করতে হবে! এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। তখন না বলে আর পারলাম না; দেখ, ঢালা খুব সহজ কিন্তু সাজানো বড় কঠিন। চাল আর ডাল যদি একবার একপাত্রে ঢালা হয় তাহলে তা দিয়ে খিচুড়ী হয় ভালো, কিন্তু আলাদাও করা যাবে না, সাজিয়ে নতূন কিছু করাও যাবেনা। ঠিক একইভাবে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারনাটা স্পষ্ট না হলে তাকে আরও উন্নতি বা অবনয়নের প্রশ্ন আসে কোথেকে! ভাল ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক মানে কি ছাত্র এবং শিক্ষক হাত ধরাধরি করে পার্কে বা বাজারে হাঁটাহাটি, ভাল ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক মানে কি ধূমপানের কল্কে বিনিময়, ভাল ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক মানে কি ব্যান্ডের তালে তালে এক সাথে লাফালাফি, ভাল ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক মানে কি ছাত্রদের মিছিলে (রাজনৈতিক হোক বা পরীক্ষা পিছানোর জন্য হোক) শিক্ষকের যোগ দেয়া বা এমন আরো বিষয়। আমি মনে করি এগুলো ছাল ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের কোন আলামত নয় বরং এগুলো হচ্ছে সামাজিক অনাচার। কেনো শিক্ষকের শিক্ষাদান পদ্ধতি কোন কোন ছাত্রের বা ঐ ক্লাশের অনেকের অপছন্দ হতে পারে, কোন শিক্ষক ক্লাশে কোন একটি বিশেষ দিনে হয়তো বিশেষ কারণে ছাত্রদের সাথে রুঢ় আচরণ করতে পারেন, কোন একজন শিক্ষক হয়তো গুরুগম্ভীর স্বভাবের হতে পারে, কোন শিক্ষক হয়তো ক্লাশের সময়ের পরে নিজের চেম্বারে ছাত্রদের সাথে সময় ব্যয় করতে চান না, কোন শিক্ষক হয়তো টিচিং এইড বেশী

ব্যবহার করেন, ব্লাকবোর্ড কম ব্যবহার করেন (তাতে ছাত্রদের নোট নিতে অসুবিধা), অপর কোন শিক্ষক হয়তো ক্লাশে ছাত্রদের প্রশ্ন করা অপছন্দ করেন; এসব বিষয় individualistic, এগুলো কোন নিয়ম মাফিক সাধারণ বিষয় নয় এবং এগুলো ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের কোন ব্যাপার নয়। সেদিনের আলাপে মনে হচ্ছিল ছাত্ররা ব্যতিক্রমী উপরোক্ত ধরনের ব্যাপারগুলোকে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের সাথে গুলিয়ে ফেলছিল এবং ছোট ছোট এসব ব্যাপার খারাপ সম্পর্কের নজির হিসাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছিল। শিক্ষকরা কি সময় মতো ক্লাশে যান, শিক্ষকরা কি নিয়মিত ক্লাশ নেন, সিলেবাস কি শেষ করা হয়, ব্যতিক্রমবাদে শিক্ষকরা কি ক্লাশে ছাত্রদের ঔৎসুক্যের অবসান ঘটান, শিক্ষকরা কি সাধারণভাবে সংযত ভাষায় কথা বলেন; এসবের উত্তর তো হাঁ বোধক। এসব ব্যাপার ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের উপাদান বটে। বুয়েটের ব্যাপারে যদি বিশেষভাবে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখা যাবে বিশ/পঁচিশ বছর আগের তুলনায় ছাত্রেরা এখন শিক্ষাসূচী বহিভূত কর্মকান্ডে (Extra-curricular activities) অনেক বেশী জড়িয়ে আছে এবং শিক্ষকরা ক্ষেত্র বিশেষে সহায়ক ভূমিকা প্যালন করে থাকেন। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে বুয়েটের শিক্ষকরা সাধারণভাবে ছাত্রদের শিক্ষাসূচী বহির্ভূত কাজে বেশী সহায়তা প্রদান করে থাকেন যদিও একাডেমিক কাজেই তারা নিয়োজিত থাকতে বেশী পছন্দ করেন। আমার জানামতে দেশের বাইরে অর্থাৎ পশ্চিমা উন্নতদেশে শিক্ষকদের সাথে ছাত্রদের শ্রেণীকক্ষ ছাড়া অন্যত্র মেলামেশার সুযোগ খুবই সীমিত, নেই বললেই চলে। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক বুয়েটে অন্য যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায়, দেশে বা দেশের বাইরে, কোন অংশে খারাপ নয়। আসলে ব্যাপারটা অন্যত্র। বুয়েটে আসার পর অনেক ছাত্র, যারা এই পর্যন্ত খুব ভাল ছাত্র হিসাবে পরিচিত ছিল, পরীক্ষায় খারাপ করতে থাকে। এদের অনেকেই তখন, তাদের সাথে যোগ দেয় রাজনীতি করার মানসিকতা সম্পন্ন কিছু ছাত্র, এক ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করতে থাকে বা আঙ্গুল নির্দেশ করে শিক্ষকদের দিকে যার কোন প্রকৃত ভিত্তি নেই। সাধারণভাবে, বুয়েটের অধিকাংশ শিক্ষকই মনোযোগী ও সময়ানুবর্তী, শৃঙ্খলা মেনে চলা এবং শৃঙ্খলা মেনে চলতে শেখানোটা তারা নিজেদের দায়িত্ব মনে করেন। এটা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সহজাত সংস্কার। এখানে একটা ব্যাপার মনে রাখা বাঞ্চনীয়, আর তা হলো, ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যে একটি অত্যন্ত সুন্দর সম্পর্ক যেমন বিরাজমান থাকা উচিত তেমনি প্রয়োজন একটি অদৃশ্য সুন্দর দেয়াল। সে দেয়াল হলো শ্রদ্ধা ও স্নেহ আদান প্রদানের। সে দেয়াল ভেঙ্গে গেলে বা ধ্বসে পড়লে স্নেহ ও শ্রদ্ধা এমনভাবে লুটোপুটি খাবে যে কোনটা কি পরখ করা মুশখিল হবে এবং সে প্রবাহ স্থবির হয়ে যাবে। শিক্ষক তাঁর সম্পর্ক অনুযায়ী তাঁর অধীত জ্ঞান ছাত্রের মধ্যে বিতরণ করবেন এবং ছাত্র সাধ্যানুযায়ী তা গ্রহণ করবেন। এই গ্রহণ-বিতরণ একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে চলে এবং সেই প্রক্রিয়ার প্রধানউপাদান হচ্ছে শ্রদ্ধা ও স্নেহ। যে ছাত্র কোন একজন শিক্ষককে শ্রদ্ধা করেনা, সে ছাত্র ঐ শিক্ষকের কাছ থেকে কিছু শিখতে পারবেনা। তেমনিভাবে কোনছাত্র যদি শিক্ষককে তার হাত ধরাধরি বন্ধুভাবে, তাহলেও সে শিক্ষকের কাছ থেকে কিছু শেখা যাবেনা । সাধারণভাবে ছাত্রদের উপর শিক্ষকদের এখনও পর্যন্ত একটি অশিথিল নিয়ন্ত্রণ আছে বলেই এত ডামাডোলের মধ্যেও বুয়েটে কিছু পড়াশুনা হয়, বুয়েটে এখনও চর দখলের মতো হল দখল পর্ব শুরু হতে পারেনি। ব্যতিক্রম যা কিছু আছে বা যা কিছু ঘটে তা ব্যতিক্রমই মাত্র। বুয়েটে যে সিলেবাস অনুসরণ করে প্রকৌশল শিক্ষা দেয়া হয় তা নিয়েও ছাত্রদের মধ্যে অতিবুদ্ধিমান কেউ কেউ প্রশ্ন তোলে। একটি ছেলে, যত মেধাবী ছাত্রই

হোক না কেন, আঠার বছর বয়সে বুয়েটে ভর্তি হয়ে উনিশ কুড়ি হতে না হতেই বুঝে নিল প্রকৌশল শিক্ষার সিলেবাস কি হওয়া উচিত, আর দেশবিদেশ দেখে আসা বিশ তিরিশ বছরের অভজ্ঞতা দিয়ে শিক্ষকরা বুঝেন না কি পড়ানো উচিত, একি গ্রহণযোগ্য কোন ভাষণ! পরিনত বয়সের পরামর্শ অবশ্যই গ্রহনীয়। প্রকৃতপক্ষে প্রকৌশল শিক্ষার সিলেবাস প্রতিনিয়ত পরিক্ষিত হচ্ছে দেশ ও দেশের বাইরের চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে। দু' বছর আগে পাশ করেছে বুয়েটের এ রকম কতজন ছাত্র বেকার আছে? তারা যা পড়াশুনা করেছে তা যদি একান্তই বেকার হতো, তাহলে তারা অবশ্যই বেকার থাকতো । তবে অনস্বীকার্য্য যে এই বেকার না থাকার যে কৃতিত্ব তা অনেকাংশে ছাত্রদের নিজেদের। ত্রুটি বিচ্যুতি ছাড়া কোন কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করা যায় না। সুতরাং বুয়েটের যা কিছু, সকলি মহৎ এমন ভন্ডামী আমি দেখাব না। বুয়েটে আসার পরে বেশ কিছু ছাত্রের বিপাকে পড়ে যাওয়া, বা খেই হারিয়ে ফেলা এবং তারই ফলশ্রুতিতে সমালোচনা মুখর হওয়া, পড়াশোনাতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলা বা খারাপ ফল করার বেশ কিছু মোটাদাগের কারণ তো আছেই। আমি যেভাবে দেখি তা হলো এমনটিই। বুয়েটে ভর্তি হয়েই একজন ছাত্র বা ছাত্রী লেখাপড়ার ব্যাপারে একা হয়ে পড়ে। কোচিং বা প্রাইভেট পড়বার কোন সুযোগ নেই। লাইব্রেরীতে যাবার অন্যভ্যাস আর একটি বড় সমস্যা। ভাষার সমস্যা তো প্রকট। বুয়েটে এসে হঠাৎ করে সকলকে সব কিছু ইংরেজীতে পড়তে হচ্ছে, লিখতে হচ্ছে এবং শুনতেও হচ্ছে। আমার সাথে কোন কোন ছাত্র দ্বিমত করে (যুক্তিসংগত ভাষ্য না দিয়ে), যদিও আমি মনে করি বুয়েটে এসে অনেক ছাত্রের ভালফল না করার ও ফলত: হতাশাগ্রস্থ হবার একটি বিরাট কারণ হচ্ছে বাড়ী বাড়ী গিয়ে বুয়েটের ছাত্রের টিউশনী করা। এটি একটি সামাজিক অনাচারও বলবো। চেইন রি-একশনের মতো। বাড়ী বাড়ী গিয়ে টিউশনীতে বুয়েটের ছাত্রের সমধিক চাহিদা এবং সে চাহিদা পুরণে বুয়েটের ছাত্রেরা ব্যাকুল। এ কাজ যে ছাত্রবিশেষকে কি পরিমাণ গ্রাস করে তা সে অনেক সময় বোঝে না। পারিবারিক অস্বচ্ছলতার কারণে হাতে গোনা ক'জন সামান্য কিছু এ'কাজ করতে পারে, দোষের না। কিন্তু তা যদি পেশাদারিত্বের পর্যায়ে পড়ে তাহলেই মুস্কিল। ছাত্রজীবনে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক নিয়ে সময়ক্ষেপ না করলে ক্ষতি নেই। যে ছাত্র আমাকে খুব ভয় করতো বলে মনে করতো ছাত্র জীবনে, দশ পনেরো বিশ বছর পরে যখন দেখা হয় দেশে বা বিদেশে, বাজারে বা অফিসে তার সে কি মধুর বিগলিত হাসি এবং স্মৃতিচারণ। সবই তার সুখ। একটি শব্দও নেই বিপক্ষে। আজকের সমালোচনামুখর মেধাবী তরুণ দশ বছর পরে নিজের প্রগলভতায় নিজেই হাসবে, তার কাছে মনে হবে বুয়েটজীবনই তার কাছে মধুরতম স্মৃতি। বুয়েটই তার সুন্দরতম তীর্থপীঠ।

ICME 2005 & Exhibition on Engineering and Technology

Dr M A RASHID SARKAR

Preamble

Engineering and Technology play a pivotal role in the development of today's world. Widespread research and innovative practices are propelling the world to a new plateau of development. Mechanical engineering is at the centre of this process.

The distinct assets of modern economy are knowledge, skills and creativity. The economic performance of a business depends more on these aspects than those of traditional factors of land, labor and capital. The competitiveness of a business cannot move without knowledge and creativity. True competition for commercial, technological and scientific leadership is inevitably coming from overseas. It is a challenge to face such globalization and competition. This challenge can only be met scientifically and technologically through research and development. Here exists the need of collaboration between academic people and industrial executives. This enhances interaction of knowledge of different fields for continuous upgrading of the products. This process in turn devises new facilities in order to make progress in a business.

ICME and Exhibition

The Department of Mechanical Engineering of BUET has been organising International Conferences on Mechanical Engineering (ICME) since 1995 as a biannual event. Along with ICME, International Exhibitions on engineering and technology have also been arranged since 2001. In continuation, the 6th ICME along with the exposition was held during December 28-30, 2005. About 40 national and multinational organizations took part in the exhibition. The exhibition has offered a unique opportunity to demonstrate the products and services of some of the local entrepreneurs and organizations. We tried to bring them closer to businessmen, investors, entrepreneurs, manufacturers, job seekers and engineering students. Nevertheless it is one of the ways to break the barrier of communication between the university and the entrepreneurs now existing in Bangladesh.

Experts from USA, Canada, UK, Japan, Australia, Korea, India, Malaysia, Singapore, Thailand and Sri Lanka took part in the conference. The Ministry

of Industries, Board of Investment and the Federation of Chamber of Commerce and Industries have participated in the ICME-2005 programs. They appreciated the outcome of the exposition and the participation of experts.

Figure: Closing Session of ICME 2005 and Exhibition

Participants of Exhibition

About 40 National and Multinational Companies participated in the exhibition this year. The list follows:

Bangla Trac Ltd, Bangladesh Power Development Board, Asia Energy Corporation (Bangladesh) Pty Ltd, ProMinent Fluid Controls Bangladesh Ltd.,Dragon Boiler Company, Bangladesh Rice Research Institute, Energypac Engineering Limited, Milnars Pumps Ltd., Polycables Industries, Navana CNG Ltd, S.A. Traders & CO., Maxim Ercon, MCW CNG Refilling Station & Conversion Workshop, Bangladesh Inland Water Transport Authority, Training Institute of Chemical Industries, Bangladesh Machine Tools Factory, Epsilon Eximco Mobil Jamuna Lubricants Ltd, Rangpur Foundary Ltd., Bangladesh Jute Research Institute, Megatek Engineering Ltd., Ahsan Automation Ltd., BOC Bangladesh Ltd, Techno HVAC System Ltd., Babel Corporation Ltd., BCSIR, Powermann Bangladesh Ltd., Sigma Pumps Ltd, Aziz Pipes Ltd., Barapukuria Coal Mining Co. Ltd., Joongbo Multimode Chemicals Ltd., Green Fuel CNG Conversion Center, LGED, Sanji Automobiles Limited.

Outcomes of Exposition

> It drew attention of national & international entrepreneurs, investors, professionals & experts.

- The exposition provided a unique opportunity for the local entrepreneurs and manufacturers to have a glimpse of technological advancements in the country.
- It helped our local entrepreneurs to contribute towards development and generate more jobs & business opportunities in the country.
- It also provided opportunities for international suppliers to expand their business.
- It helps facilitate further industrialization with Competitiveness.
- It may contribute significantly towards establishment of new & diversified industries.

In the ICME 2005 many experts from home and abroad exchanged ideas on technology transfer. The Exhibition has displayed many new technologies developed in the country. On the closing session a bunch of recommendations was drawn to develop local technology.

Students' Projects

Some Students' Projects have been displayed in the Exposition. They are all innovative. The list of Projects follows:

Automatic Window Blinds, Computer Controlled Elevator, Cable Car, Time Controlled Liquid Vending Machine, Voice Controlled Car, Turbine Flow Meter, Robot Eye, CNC PCB Layout Machine, Magnetic Train, Rectangular Clark 'Y' type Aeroplane, Computer Controlled Elevator.

Conclusion

Such Conference and Exhibition are vital today for expanding industries. This provides opportunity for exchanging knowledge with local foreign experts. It is an excellent environment to introduce the local products and technologies. The local manufacturers will have opportunity for development and to generate opening for new Engineers.

যন্ত্রকৌশল সংসদ : কার্যক্রম ও সম্ভাবনা

ড. মোঃ এহসান

যন্ত্রকৌশল সংসদ বুয়েট-এর যন্ত্রকৌশল বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের একটি ঐতিহ্যবাগী মিলিত ফোরাম। বিভাগের সাথে এর সম্পর্কটা দীর্ঘদিনের, তবে কখনও কখনও এর কার্যক্রম গতিশীল ছিল আবার কখনও বা কিছুটা স্তিমিত হয়েছে। যন্ত্রকৌশল সংসদের কার্যক্রমের শুরুটা আমার জানামতে ঠিক সেভাবে রেকর্ডেড নেই, তবে বর্তমানে বিভাগের প্রবীনতম শিক্ষক শ্রদ্ধেয় প্রফেসর এম. এ. তাহের আলী স্যারও বলেন তিনি ছাত্রাবস্থায় Mechanical Engineering Association-এর অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ ১৯৮৬ সালে যন্ত্রকৌশল সংসদ নামকরণ করা হয়। ঐ সময়টায় ডঃ মোঃ তামীম স্যার (বর্তমানে বুয়েট-এর পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধ্যাপক) ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করতেন। ১৯৮৮ সালে (আমি তখন ২য় বর্ষের ছাত্র) একটা মনোগ্রাম প্রতিযোগীতার পর যন্ত্রকৌশল সংসদের বর্তমান মনোগ্রামটা নির্বাচন করা হয়। মনোগ্রামটা তৈরী করার সময় আমার একটা Theme ছিল চারটি ছোট গিয়ার (বুয়েটে একসাথে ৪টির বেশী ব্যাত থাকার কথা নয়) বিভাগের চারটি ব্যাচের ছাত্র-শিক্ষকের প্রতীক যাদের মিলিত প্রচেষ্টায় মাঝখানের বড় গিয়ারটি ঘুরবে– যা যন্ত্রকৌশল সংসদের প্রতীক। এরপর পরবর্তী বছরগুলিতে এর কার্যক্রম আরও বিস্তৃত হয়। ১৯৯০ সালে পালিত হয় প্রথম মেকানিক্যাল ফেস্টিভ্যাল এর দিনব্যাপী অনুষ্ঠান। ঐ বৎসরই যন্ত্রকৌশল সংসদের প্রকাশনা "অযান্ত্রিক" এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়, এরপর আমার জানামতে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত "অযান্ত্রিক" নিয়মিতভাবে বার্ষিক স্মরণিকা হিসাবে প্রকাশ করেছে যন্ত্রকৌশল সংসদ। এরপর ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সংসদের কার্যক্রম তেমন চলেনি। ২০০১ সাল থেকে একবার এর কার্যক্রম গতিশীল করা হয় এবং এর ধারাবাহিকতায় এখনও বা প্রায় নিয়মিতভাবে চলছে। ২০০৬-এ "অযান্ত্রিক" আবার আত্মপ্রকাশ করছে যা আশা করি বভিষ্যতে নিয়মিতভাবে আবার প্রকাশ করা সম্ভব হবে। বর্তমানে যন্ত্রকৌশল সংসদের পক্ষ থেকে সারা বৎসরই কয়েকটি অনুষ্ঠান আযোজন করা হয় এর মধ্যে - নবীন ছাত্রদের বরণ, বাৎসরিক "মেকানিক্যাল ফেস্টিভ্যাল", বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা, কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট সেমিনার, স্টুডেন্ট প্রজেক্ট শো, ইত্যাদি আয়োজন ও উচ্চ-শিক্ষা করা হয়ে থাকে। বর্তমান গঠনতন্ত্র অনুসারে বিভাগের সব ছাত্র-ছাত্রীই এর সদস্য। প্রতি ব্যাচের প্রতি শাখা থেকে ২ জন করে শ্রেণী প্রতিনিধি নিয়ে এর কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়। বিভাগীয় প্রধান সংসদের সভাপতি, ও একজন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কমিটির বাইরেও সংসদ পরিচালনা করে থাকেন। আসলে যন্ত্রকৌশল সংসদের যে কার্যক্রম তার কোন ধরা-বাধা পরিধি নেই। যন্ত্রকৌশল সংসদের মূল মন্ত্র লেখা-পড়াকে মূখ্য রেখেই তার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের ও শিক্ষকদের অংশগ্রহনে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা যা আমাদের গ্রাজুয়েটদের সচেতন ও মননশীল প্রকৌশলী হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে। বস্তুত এই আঙ্গিকে ছাত্র–ছাত্রীরা চাইলে এর কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে পড়াশুনার চাপের মধ্যে এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের বা তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহনের যৌক্তিকতা বা প্রয়োজন কি? আমার মতে, বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র লেখা-পড়ার জায়গা নয়, গ্রাজুয়েটদের সামগ্রিক পার্সোনালিটি ডিভেলপমেন্ট এর ক্ষেত্রও বটে। কর্মজগতে প্রবেশ করলে কর্মদক্ষতার পাশাপাশি ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতাও একটা গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ একটা ব্যক্তিত্ব বিকাশ সহ এর সুযোগ করতে পারে। এই অনুষ্ঠানগুলি আয়োজন মূলতঃ ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়েই করানো হয়। ফলে তারা - প্রজেক্ট সিডিউল, বাজেট, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, টীম ওয়ার্ক, টীম স্পিরিট, পাবলিক রিলেশানশীপ, ডিসিপ্লিন, সময়ানুবর্তিতা ও সেক্ষ এক্সপ্রেশন এগুলো শেখার বা চর্চা করার ছোট বড় জানা সুযোগ পায়। দায়িত্ব নিতে শেখা, পরবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়া এবং নিজের কাজটি সবার সামনে তুলে ধরা এর সবকিছুই চর্চার সুযোগ এনে দেয়। আমার মতে এ ধরনের চর্চা ও অংশগ্রহণ ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতনতা ও মননশীলতা বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখে।

যন্ত্রকৌশল সংসদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একই বিভাগের ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে সুসংহত করা। ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকের মধ্যে যার যার অবস্থানে থেকেও একটা সুস্থ্য ও সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলাটা শিক্ষা ও শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রমের জন্যও একান্ত জরুরী। আমার মতে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কটা যতটা আন্তরিক ও সুসংহত হবে, বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় তা ততটাই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। ক্লাশ রুমে এ সম্পর্কটা মূলত লেখা-পড়াকে ঘিরে। তবে যন্ত্রকৌশল সংসদের আয়োজনগুলি এর বাইরেও ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ককে একটা ভিন্ন মাত্রা তৈরী করার সুযোগ করে দেয়। বুয়েট এর বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের একটা বড় অংশ অনাবাসিক তাই একই বিভাগে পড়লেও বিভিন্ন ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ছকে বাধা রুটিনের ফাঁকে পরস্পরের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ সীমিত। অনাবাসিকের ক্ষেত্রে আরও প্রযোজ্য। এ ধরনের কার্যক্রমের আযোজন বিভিন্ন ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলছে। আজকে যে ভাই বা বোনটি ২/৩ ব্যাচের সিনিয়র, পাশ করে বেড়োবার সময় তার কাছ থেকেই হয়ত উচ্চ-শিক্ষা বা কর্মসংস্থানের সুযোগের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা উপদেশটা পাওয়া যেতে পারে। আমি গত কয়েক বছরে ছাত্র-ছাত্রীদের এরকম যোগাযোগের বেশ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি যা অত্যন্ত আশাপ্রদ।

বর্তমান চাহিদার প্রেক্ষাপটে সচেতন ও উপযুক্ত প্রকৌশলী হিসাবে এ বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যন্ত্রকৌশল সংসদ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই কার্যক্রমকে আরও যুগোপযোগী করে তোলার ব্যপারে ধারাবাহিকভাবে বিভাগের আমরা আগ্রহী। তবে এ ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকেই বাস্তব ভিত্তিক নতুন চিন্তা ধারা আসলে তা যন্ত্রকৌশল সংসদের কার্যক্রমকে আরও প্রসারিত ও গতিশীল করতে পারে। তবে এ ধরনের কার্যক্রমে সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহন এগুলি আয়োজনে সার্থক করবে।

শিক্ষার লক্ষ্য

ডঃ মুহ. মাহবুবুর রাজ্জাক

একটা যুগে অধ্যয়নটা ছিল তপস্যার মত। বলা হতো "ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ", অর্থাৎ অধ্যয়নই হলো ছাত্রদের তপস্যা। সেই যুগে অধ্যয়নের জন্য ছাত্রদের যেতে হতো তপোবনে। রাজনীতি, মারামারি, যুদ্ধবাজিতে জড়ানোর সুযোগ ছিলনা তাদের। যুদ্ধবিগ্রহের কাজটা করতেন ক্ষত্রিয়রা। এখন দেশে দেশে যুদ্ধ লাগলে প্রথমেই রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেয়া হয় ছাত্রদের। ছাত্রশিক্ষকদের একটি বিপুল অংশ আজ অধ্যয়ন ও তপস্যার গন্ডি মাঁড়িয়ে সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতিতে সক্রিয়। শিক্ষাঙ্গন তাই আজ ক্ষণে ক্ষণেই রণাঙ্গনে পরিণত হয়। এই পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হয়ে কবি আল মাহমুদ দেশের প্রধাণ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন:"ওটা কি ডাকাতদের গ্রাম?" ভাষা আন্দোলণ, স্বাধীণতা সংগ্রামসহ জাতির ইতিহাসের বিভিন্ন মাহেন্দ্রক্ষণে ছাত্ররা কালজয়ী অবদান রেখেছে। কিন্তু তারপরেও সাবেক প্রধাণ বিচারপতি মোস্তফা কামালের ভাষায় বলতে হয়: "এই মাহেন্দ্রক্ষণ কি অনন্ত কাল চালু থাকে? সবকিছুরই একটা বিরতি আছে, যুদ্ধক্ষেত্রেও যুদ্ধবিরতি হয়, পরিশেষে শান্তি স্থাপিত হয়, হয় একপক্ষের পরাজয়ে, নয় যুদ্ধক্লান্তিতে। কে বা কারা রাজনীতির যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রবাহিনী ক্যাম্পাসে ফিরে যাবে না? সক্রিয় রাজনীতিতে অব্যহতভাবে লেগে থাকাই কি আমাদের ছাত্র-শিক্ষকদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি অনুচ্চারিত অঙ্গীকার? এ আনুগত্যের কাছে কি অন্য সব দায়িত্ব ম্লান?" কথাগুলো টানতে হলো এ কারণে যে, এই বুয়েটেও মাঝে মাঝে লাগাতার ছাত্র ধর্মঘটের হুমকি শুনতে হয় এমন সব ইস্যুতে যে ইস্যুর সমাধান সহসাই হওয়ার নয় - অথবা ইস্যুটির সমাধান পুরোপুরিই বুয়েটের এখতিয়ারের বাইরে। অন্যায়ের প্রতিবাদ সচেতন মানুষ অবশ্যই করবে, তবে দায়িত্বশীলতা বিসর্জন দিয়ে নয়। কারো বিচার বা ফাঁসির দাবীতে পড়াশুনা বাদ দিয়ে লাগাতার ছাত্র ধর্মঘট আহম্মকি ছাড়া আর কি হতে পারে?

একটা সময় ছিল যখন লেখাপড়ার জন্য তল্পীতল্পা সহ জ্ঞাণী শিক্ষকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হতো। নবী মুহাম্মদ (দঃ) একে উৎসাহিত করে বলেছিলেন - জ্ঞাণ আহরণের জন্য প্রয়োজনে সুদূর চীনদেশেও যাও। এদেশের ছেলে অতীশ দিপংকর কয়েকশত বছর আগেই তুষারঢাকা পাহাড় পর্বত মাঁড়িয়ে জ্ঞাণ সাধনার জন্য তিব্বত গিয়েছিলেন। আজকাল শিক্ষকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে শিক্ষা দীক্ষার দিন শেষ। শিক্ষকরাই আজ দ্বারে দ্বারে ঘুরে জ্ঞাণ বিপণন করছেন। কোন কোন শিক্ষককে জানি যারা কমপক্ষে ছয় সাতটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্ট টাইম ক্লাশ নেন। শিক্ষা আজ আর সাধনার ধণ নয়, পুরাদস্তর পণ্যে পরিণত হয়েছে। আজকাল শিক্ষার তকমা কেনা বেঁচা হয়। পরিণামে লোকজন শিক্ষিত হয় বটে, কিন্তু মনুষত্বের বিকাশ ঘটেনা। শিক্ষা ব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তি যদি মজবুত না হয় তবে এই অবস্থা থেকে উত্তরণের আশা ক্ষীণ। শুনেছি আজকাল স্কুল শিক্ষকদের চাকুরী ঘুষ ছাড়া হয়না, মাসিক বেতন ঘুষ ছাড়া হয়না। জীবিকার তাগিদে দূর্ণীতির সাথে আপোষ করা একজন শিক্ষকের নৈতিক অবস্থান কত আর ভালো হতে পারে? কেউ কেউ বলেন, দূর্ণীতিবাজদের তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় - ঘুষখোর, চরম ঘুষখোর এবং ইঞ্জিনিয়ার। এদের মধ্যে মেধাবী হিসেবে গণ্য ইঞ্জিনিয়ারদের জায়গাটি সবার উপরে। যারা মেধাবী সর্বক্ষেত্রেই তারা মেধার স্বাক্ষর রাখবেন - এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মেধার এই বিকৃত চর্চার কারণে বাংলাদেশ অন্য কোথাও তেমন সাফল্যের মুখ না দেখলেও দূর্ণীতিতে লাগাতার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসছে - এটি মোটেই সুখকর ঘটনা নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ও কার্যকারিতা নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন জাগে। তপোবনের যুগে জ্ঞাণ সাধনার অর্থনৈতিক মূল্য ছিল কিনা জানা নেই, পার্থিব কোন লাভের লক্ষ্যতো মোটেই ছিলনা। তবে এখন দুটোই আছে। কাজেই সেইযুগের মতো নিঃস্বার্থ জ্ঞাণ চর্চার আশা নিতান্তই দুরাশা। শিক্ষার লক্ষ্য যদি স্পষ্ট না হয়, তবে শিক্ষাঙ্গনের অরাজকতা কাটবে না। বুয়েটেও আমাদের খতিয়ে দেখা উচিত শিক্ষার লক্ষ্যটি আমাদের কাছে স্পষ্ট কিনা।

শঙ্খ ঝিনুক

মুনমুন, #০৫১০০১৬

দূর সমুদ্রের অতলে সাদা ঝিনুক এক-শঙ্খ ঝিনুক
প্রাচীরে তার আশাহীন জলের ক্রন্দন ফেরে বারেবার
কালচে নীল ঢেউ ছাড়া কিছু নেই আর-শুধু কান্না দুর্নিবার
তবুও ঝিনুক স্বপ্ন দেখে পৃথিবীতে আলো পৌছে দেবে সে
হায়! তুচ্ছ ঝিনুক তুমি মুক্তোর অভিমান জানলে না ?
দিন যায়,- আরনা-ঝিনুক!! আর তুমি স্বপ্ন এঁকো না–

এমনই গেল সময়– এল সেই ক্ষণ– এল খবর নির্মম সুন্দরের
সেই অমূল্য তার অস্তিত্বের ঠাঁই চায় ঝিনুকের উন্মত্ত প্রতি কণিকায়,
অবুঝ ঝিনুক! ভুলোনা- ভুলোনা অমূল্যের অপূর্ব নিষ্ঠুরতায়–
শুধু যে নিতে চায়,– কিছু সে দেবে না তোমায় ॥

সরল ঝিনুক, -তুমি না দেখা ঐশ্বর্যের মাঝে হারালে
বয়ে চলল সময়- প্রতিটি নিঃশ্বাসে তারে নিঃশ্বাস বিলালে
প্রতিটি কষ্ট তোমার- সুখগুলো তাকে দিলে;
তৃষ্ণায় খেলে না জল– আপন রসে তাকে রসনা বিলালে।
ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেলে তুমি– মমতায় গড়ে দিলে তাকে ॥
যখন শক্তিহীনা তুমি এলে ধ্বংসের শেষ প্রহরে
অপূর্ব আনন্দে দেখলে– তোমারই দেহে সে অমূল্য–আলো করেছে ॥
ঝিনুক, তুমি লুটালে চিরতরে– তুমি ঘুমালে–
উজাড় হল খোলস তোমার; আর তোমার অমূল্য ?
কোথায় সে ?
গোলাপী মুক্তো– তোমার মূল্যহীন দেহ ছেড়ে মর্ত্যের লালসা মিটাল
তাকে ঘিরে হল গর্ব ঐশ্বর্যের বাড়াল সৌন্দর্য
ঝিনুক, একবার চোখ মেলে দেখো তোমার অমূল্যকে
দেহের প্রতিটি কণার মূল্যে যাকে গড়েছিলে...
শুধু দেখো, আর যদি পার,
এক ফোঁটা অশ্রু দিয়ে
তার গোলাপী দেহটুকু
ছুঁয়ে দিয়ে যেও ॥

অ্যা ল বা ম

লাদেন : সাদ্দামের দেখি প্যান্ট ঢিলা!

সাদ্দাম : আর তোর যে আলগা দাঁড়ি খুইলা যাচ্ছে... তার কি?

তুই রাজাকার!!

লিফটের বোতাম তো চাপছিলাম ছয়তলায় যাওয়ার জন্য... এত উপরে আইলাম কেমনে (মঙ্গলগ্রহ)??

ভাঙা হৃদয় ঝালাই
করিয়া থাকি!

ও.এ.বি-তে
১/১-এর এক্সট্রা
ক্লাস (!)

কমে টমে না?

মর্জিনা কি দোতলায় নাকি??

জিলিয়ান এন্ডারসন-এর
নৌকা ভ্রমণ (!)

ঘুমাবি ?
এই নে বালিশ।

আজ একটা পাখি (!) শিকার করেই ছাড়বো।

লাইব্রেরি টু ক্যাফে সার্ভিস...
সিঙ্গেল ১০ ৳
কাপল ৫ ৳

আরো জোরে হেইও!
ই.এম.ই বিল্ডিং ধ্বসলো বইলা

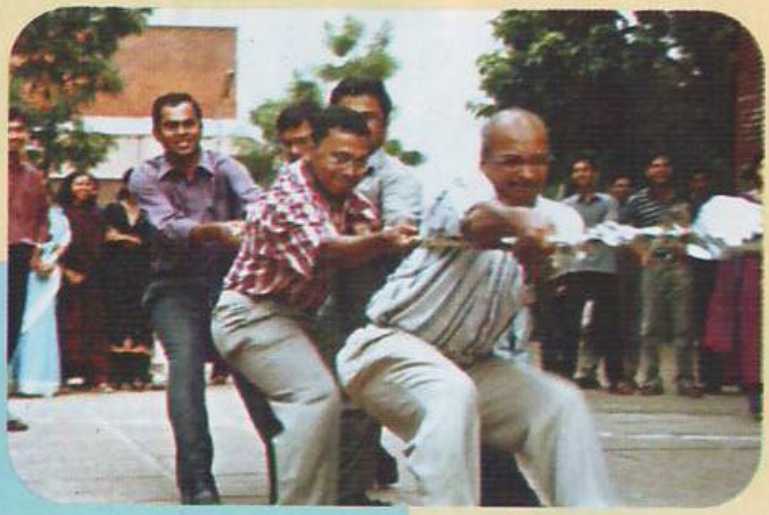

ঝাঁকে ঝাঁকে
জাটকা, কারেন্ট
জালে আটকা...
ঐ, আরও
জোরে...

ইস! নেইল
পলিশটা আবার
লাগাতে হবে।

ছয় ইঞ্চি হিল
পড়েও দেখি এক
ফুট শর্ট...!

অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সহিত যন্ত্রকৌশল বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ।

আই.সি.এম.ই ২০০৫-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ।

যন্ত্রকৌশল বিভাগের প্রয়াত ছাত্র শাকিলের স্মরণে

বেইজিং রোবোকন ২০০৬-কিছু অযান্ত্রিক কথা

মামূর, # ০১১০০৩৪

দক্ষিণ চীন সাগরের ২৪ হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সের বোয়িং বিমান। আমি আর রাসেল ভাই কিছুক্ষণ ঘুমাচ্ছি আর কিছুক্ষণ প্লেনের জানালায় উঁকিঝুঁকি মেরে সমুদ্রের মাঝে 'কিছু একটা' খোঁজার চেষ্টা করছি– হয় কোনো জাহাজ নয়তো কোনো দ্বীপ। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ২-৩টা সাদা জাহাজের দেখা পেলাম। কিছুক্ষণ পর কয়েকটা ছোট্ট দ্বীপও দেখা গেল। আরো কিছুক্ষণ পর শুরু হলো চীনের মূল ভূখণ্ড। ওপর থেকে সবুজের সমারোহ আর তার বুক চিরে বয়ে চলা রূপালী নদীর সর্পিল গতিপথ দেখে মুগ্ধ হলাম। পাশে তাকিয়ে দেখি রাসেল ভাই, অভি ভাই, জহুরুল হক স্যার আর বিটিভির পরিচালক বদরুজ্জামান সাহেব সবাই গভীর ঘুমে অচেতন। বেশ ক'ঘণ্টা পর প্লেন বেইজিং শহরের আকাশে চক্কর দেয়া শুরু করল। হাজার বছরের পুরনো শহর বেইজিং এখনও বর্ধিষ্ণু। আমরা বুয়েট থেকে একটা টিম এখানে এসেছি 'এ.বি.ইউ. রোবোকন রোবট কনটেস্ট'-এ বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে। কোনো জায়গায় দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে যাওয়া আমাদের জন্যই এই প্রথম। তাই আমি, রোবট পাগল অভি ভাই আর ক্যাম্পাসের পরিচিত মুখ রাসেল ভাই আমরা তিনজনই বেশ Excited।

বেইজিং পৌঁছানোর পরপরই কনটেস্ট এর জন্য প্রস্তুতি, রোবটের বাক্স খুলে রোবটগুলো Reassemble করা ইত্যাদি কাজ চলল দুইদিন ধরে। এরই মধ্যে ২০টি টিমের মধ্যে গ্রুপ নির্বাচনও হয়ে গেল। গ্রুপে থাইল্যান্ডের সাথে অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কাকে পেয়ে আমরা তখন অন্তত একটা জয়ের স্বপ্ন দেখছি। প্রতিটি টীমের জন্যই দোভাষীর ব্যবস্থা ছিল। আমাদের দোভাষী সুন না (হেলেন) ইংরেজিতে অনার্স করছে বেইজিং ফরেন স্টাডিজ ইউনিভার্সিটি (BFSU) তে। ওদের এই ভার্সিটিতে নাকি মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের তুলনায় বেশি (বুয়েটের উল্টো) তাই ওরা BFSU দিয়ে বোঝায় Boy Friend Searching Union। হেলেনকে দিয়েই শুরু, তারপরও দেখলাম চীনা ছেলেমেয়েরা খুবই হাসিখুশি আর গল্পবান হয়। কনটেস্ট এর টিমগুলোর মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশই হচ্ছে নতুন। তাই আমাদের জন্য অংশ নেয়াটাই বিরাট ব্যাপার ছিল। এ কারণে আমরা ছিলাম বেশ চিন্তামুক্ত। কনটেস্ট ভেন্যু বেইহাং ইউনিভার্সিটির জিমনেসিয়ামে প্রতিটি টিমের জন্য রোবট জোন নির্দিষ্ট ছিল। আমাদের জহুরুল হক স্যার হচ্ছেন মহা আড্ডাবাজ (স্যারের বিখ্যাত হাসি যে শুনেছে সেই বিশ্বাস করবে) সাথে আমরা তিনজনও। তাই প্রায়ই দেখা যেত আমাদের জোন এর সামনে বিভিন্ন দেশের ছেলে-মেয়েদের সাথে আমরা চারজন জমজমাট আড্ডায় ব্যস্ত। ভারতীয় টিমের দোভাষী ছিল এক চীনা ছেলে, সে আবার হিন্দির পাশাপাশি কিছুটা বাংলাও জানতো। স্যার তাই ওর নাম দিলেন বাঙাল। এই বাঙাল একদিন অভি ভাইকে ছোট্ট একটা বাঁশ দিয়ে দিল। অভি ভাই তখন আশপাশের সব (!) চীনা মেয়েদের সাথে ১ঃ১ ছবি তুলতে ব্যস্ত। এমন সময় বাঙাল এসে বলল সেও ওদের সাথে ছবি তুলবে। অভি ভাইতো রীতিমতো বিরক্ত– এতো কাবাব মে হাড্ডি, বলে দিলেন, 'না, তোমার সাথে পরে ছবি তুলবো'। এদিকে বাঙালও কম ত্যাঁদড় নয়, ভাঙা বাংলায় বলল, 'আমি কি দোষ করলাম ? ওদের (মেয়েদের) সাথে ছবি তুলছেন, আমি কেন নয় ?' অভি ভাইতো রীতিমতো embarased আর তার সাথে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটাস্বরূপ স্যারের বিখ্যাত হাসিতো আছেই।

অভি ভাইয়ের আরেকটা কাহিনী বলি। গ্রেটওয়াল থেকে ফেরার পথে আমরা এক বিরাট রেস্টুরেন্টে থেমেছি লাঞ্চ করতে। আমি, রাসেল ভাই আর জহুরুল হক স্যার এক সঙ্গে বসলেও অভি ভাইকে

দেখলাম চীনা মেয়ে নাতালি (নেপাল টিমের দোভাষী)-র সাথে বসে খাওয়া দাওয়া করছে। স্যারের দিকে তাকিয়ে দেখি মুচকি হাসছেন। সেদিনই যখন হোটেল লবির পাশে রেস্টুরেন্টে গেলাম, দেখি দু'জনে কোক খাচ্ছেন। ফিরে আসার সময় নাতালিকে বললাম- 'See you'। নাতালি তখন কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, 'See you ? can I ever see you again?' মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল এটা শুনে। মাত্র পাঁচদিনের পরিচয়েই ওদের কয়েকজনের সাথে খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, রুমে ফিরে স্যারকে সব ঘটনা জানাতেই তিনি বললেন, 'হুমম, খুবই চিন্তার কথা। আমরা তো 'একজন কম' বা 'একজন বেশি' নিয়ে যেতে পারবো না।'

হোটেল থেকে ভেন্যুতে যাতায়াতের জন্য বাসের ব্যবস্থা ছিল। বাসে আমাদের সাথে বসতো ক্রুনেই আর মিশরের ছেলেরা। আমরা যে যার মাতৃভাষায় গান ধরতাম আর অন্যরা অর্থ না বুঝলেও গলা মিলিয়ে চলত। একবার আমার ঠিক সামনের সিটেই বসল হেলেন আর আরেক চীনা মেয়ে, জয়েস। ভাবলাম একটু মজা করা যাক। ওরা নিজেদের মধ্যে চীনা ভাষায় কিসব যেন আলাপ করছিল। আমি এরই মধ্য থেকে একটা বাক্য মুখস্ত করে ফেললাম তারপর মিনিটখানেক পর সেটা যখন ওদেরকে বললাম ওরা তো আকাশ থেকে পড়ল- 'ও চীনা ভাষা জানে ? এতক্ষণ যা বললাম সব বুঝেছে ?'

কনটেস্ট এর সব পর্ব শেষ হওয়ার পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো টিয়েন আন-মেন স্কয়ার, ফরবিডেন সিটি আর গ্রেটওয়াল দেখতে। ফরবিডেন সিটি ছিল চীনা রাজ পরিবারের আবাসস্থল। বিশাল এলাকা জুড়ে শুধু প্রাসাদ আর প্রাসাদ। এক সময় এখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, তাই এর নাম ফরবিডেন সিটি। সেখান থেকে কাছেই টিয়েন আন-মেন স্কয়ার- বিশাল এক খোলা জায়গা, শরীর জুড়ানো জোরালে বাতাস বইছিল সেখানে। এরই মধ্যে দেখা গেল ছেলেমেয়েরা অদ্ভুত আকারের সব ঘুড়ি ওড়াচ্ছি। হেলেনের কাছ থেকে জানলাম, চীনা লোকজন এসব স্কয়ার মানে খোলামেলা জায়গা খুব পছন্দ করে। শুধু বেইজিং নয়, অন্যান্য শহরগুলোতেও এ ধরনের অনেক স্কয়ার রয়েছে। চীনের মহাপ্রাচীর গ্রেটওয়াল দেখতে আমরা গেলাম শহর থেকে একটু দূরে পাহাড়ি অঞ্চল বাদালিং'-এ। বাস থেকে প্রাচীরের দৃশ্য দেখে শিহরিত হলাম। বিশাল পাহাড়শ্রেণীর ধূসর গা বেয়ে আঁকাবাঁকা হয়ে এক গুরুগম্ভীর বেশে উঠে গেছে ওপরের দিকে- যেন আকাশকে ছুঁতে চাইছে। স্বর্গের সিঁড়ি বোধহয় এ ধরনেরই কিছু হবে। বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন রাজ বংশের কীর্তি মিশে আছে এই মহাপ্রাচীরের বিভিন্ন অংশে। গ্রেটওয়ালে ওঠার প্রবেশ পথে লেখা দেখলাম- 'you are not truly a strong man until you have climbed to the top of the greatwall'। দেখেই আমাদের রক্ত গরম হয়ে গেল। মাত্র এক ঘন্টা সময়ের মধ্যে ফিরে আসার কথা থাকলেও আমি আর রাসেল ভাই উৎসাহের অতিশয্যে একেবারে চূড়ায় উঠে গেলাম, সাথে ছিল আমাদের মিশরীয় আর ভারতীয় বন্ধুরা। নামার পথে দেখি অভি ভাই দাঁড়িয়ে আছে। মোটামুটি ৭০% উঠার পর আর উঠতে পারছেন না আবার নামতেও পারছেন না। রাসেল ভাই আমাকে বললেন, 'অনেক দেরি হয়ে গেছে, তুমি অভিকে নামতে সাহায্য কর, আমি নিচে নেমে স্যারকে manage করছি।' অভি ভাইকে নামতে বলায় উনি বললেন, 'আমি নামতে পারবো না, তুমি 'দীপু নাম্বার টু' দেখ নাই ?' যাই হোক, অভি ভাইকে নিয়ে নিচে নামতে দেখি রাসেল ভাইয়ের মুখ বাংলা পাঁচ, স্যারের ধমকের ঝাপটা (সংক্ষিপ্ত : মাত্র ১০ মিনিট) সবটাই ওনার ওপর দিয়ে গেছে।

পরদিন ভোরবেলায় আমাদের ফিরে আসার পালা। এই চীনের মহাপ্রাচীর, বিভিন্ন দেশের বন্ধু আর চীনাদের আতিথেয়তা ছেড়ে চলে আসার সময় বারবার নাতালির কথাটাই মনে আসছিল, 'Can I ever see you?' বেইজিং রোবোকনের রোবট ডিজাইন, মসকেট, মাইক্রোকন্ট্রোলারের খটমটে যান্ত্রিকতার পাশে এসব অযান্ত্রিক স্মৃতিগুলো চিরকাল মনের মাঝে অটুট হয়ে থাকবে।

ভালবাসাহীনতায় কে বাঁচতে চায় রে কে বাঁচতে চায়?

-ওয়াহিদ ইবনে রেজা (বাপ্পী)

১.
আবার তোমার আকাশ জুড়ে
মেঘ কে দিল দিন দুপুরে ?
চোখ মেলে মেয়ে তাকিয়ে দেখ
মেঘ সেজে হায় আমি দাঁড়িয়ে।

২.
আর কাহাতক ছলনা ভুলে
শুধু শুধু মুখ তুলে জোছনা দেখা যায়!
সে তো আর আসবে না ফিরে,
তপ্ত বালু তীরে
ক্লান্ত পথিকের মত এই অবেলায়।

৩.
এইতো এসে গেছে সে
দরজার ওপাশে,
তবু কেন মিথ্যে লাজ
অভিমান বিলাসে।

৪.
ভাললাগেনা বলতে আমার
স্বপ্ন সুখের দিন
তবু জানি আসবে সেক্ষণ
কত যে রঙীন!
রঙ্গীন হাসি হাসবি যে তুই
তখন সারাক্ষণ।
সেই হাসিটা দেখতে আমার
আকুল হয়ে মন।

৫.
এসেছ নতুন বছর
নবাগত ১৪১৩
নতুন বছরে আমার কথা
ভেবে দেখতে পার।

৬.
এখনো বৃষ্টি পড়েনি
তবু বৃষ্টির চিহ্ন দেখা যায়,
আর কত রাত কেটে যাবে এই মিথ্যে ছলনায়।

৭.
হায় রে আমার একলা দুপুর
খুব ব্যাথিত কাঁদে
পাওয়া না পাওয়ার
দুঃখ সবি
জমাট বাঁধে কাঁধে।

৮.
হায়রে আমার একটা বছর
চোখের জলের ঘোরে
এ বছরে নতুন করে ভাববো আবার তোরে

৯.
বৈশাখী আজ তোমার সাথে
করতে হবে সখ্য
তার সাথে আর না হোক দেখা
না পেলাম আর দুঃখ।

১০.
আমার অন্তরও
বাহিরে দেখি
কোথাও কেউ নাই
জনম জনম গেল
তাহারই দোহাই ।

১১.
কখনো সুন্দর তাহাকে ছোঁবে
কখনো সে সুন্দর কে
মাঝখানে কবি শুধু দেখিবে নীরবে।

১২.
ঝাপসা চোখের পৃথিবী আমার
আঁধারেতেই থাকে
তুমি এসে দাঁড়ালে পরে
আলোর তৃষ্ণা মেটে।

Sessional : অতঃপর

আহমেদ জেনান মোস্তফা, #০১১০০৫৫

বুয়েট লাইফটায় একটা Night mare হলো দুপুর বেলায় Sessional গুলো। গত চারটা বছরে অনেক Sessional করলাম। তবে এখন সেই স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সেগুলোকে আর তত Boring মনে হচ্ছে না। তার কারণ হলো বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া কিছু টুকরো টুকরো ঘটনা। এরকম কিছু ঘটনাই দিয়ে দিলাম আপনাদের জন্য অযান্ত্রিকে। First year-এর ঘটনা। Programming language-এর Sessional বড় বড় প্রোগ্রাম প্রায় 50-60 লাইন লিখে run করাতে হয়। Sessional -এর প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে যখন সবার মোটামুটি টাইপ করা শেষ এমন সময় গগন (ছদ্মনাম) ঘোষণা করল, 'স্যার আমার পিসি তো হ্যাং করেছে।' তো স্বাভাবিক Solution যা, সেটাই স্যার বললেন যে restart করো; যেই না গগন restart করেছে অমনি পাশে বসা ইয়াকুতের আর্ত চিৎকার 'আল্লারে আমার পিসিটা রিস্টার্ট করছেন ক্যান'। এরপর থেকে আমরা পারতপক্ষে গগন পাশের সিটটা avoid করে চলি। বলাতো যায় না যদি রিস্টার্ট হয়ে যায়।

Second year fuel testing lab : fuel-এর flash point fire point বের করতে হয় এমন সব টেস্ট। যাই হোক viva নেবার সময় শ্রদ্ধেয় স্যার একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছেন আর আমার বন্ধুবর বুদ্ধের মতো মৌন হয়ে আছে। এমনি করে করে স্যার প্রায় তার ধৈর্য্যের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেলেন। এমন সময় স্যার জিজ্ঞেস করলেন, Fire point বের করার সময় তুমি কোথায় ছিলে। বন্ধুবর ভাবল এটাও ভাইবার একটা অংশ। তাই সে বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে জবাব দিল 'স্যার আমি স্যার, কিছু জানি না আউয়াল ভাই এসে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আমার স্যার কোনো দোষ নাই।'

আমার এই বন্ধুটির বেশ কিছু গুণ আছে। এর মধ্যে একটা হলো সে ঘোড়ার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমাতে পারে। এটা খুব স্বাভাবিক দৃশ্য যে, Sessional-এর সময় স্যার ব্রিফ করছেন আর আমার বন্ধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমাচ্ছে। মজার ব্যাপার হলো খুব কাছাকাছি দাঁড়ালে তার নাক ডাকার শব্দও শুনতে পাওয়া যায় বলে জনশ্রুতি আছে।

আরেক দিনের ঘটনা, এইবারের টিচার কিঞ্চিৎ রাগী প্রকৃতির। তুচ্ছ ঘটনা নিয়েও তিনি তুলকালাম কান্ড বাধিয়ে দেন। তো দৃশ্যটা মোটামুটি এই রকম যে, তিনি হাতে এক বান্ডিল রিপোর্ট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আর Sessional-গ্রুপের ছাত্ররা তাকে ঘিরে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে। তো তিনি Clockwise বকাঝকা শুরু করলেন। একটা একটা করে রিপোর্ট বের করছেন আর তার সাথে চলছে অবিশ্রান্ত গালিগালাজ। এরকম বকা ঝকার এক পর্যায়ে সিফাত নামে এক বন্ধুকে তিনি বকতে লাগলেন, এটা কি লিখেছ, হাতের লেখা এত খারাপ কেন, Discussion তো পুরোপুরি কপি...' বকা ঝকার এক পর্যায়ে তিনি চরম উত্তেজিত হয়ে সিফাতকে বললেন, discussion-এর এই পয়েন্ট টা দিয়ে তুমি কি বোঝাতে চেয়েছ। বোঝাও। এতক্ষণে সিফাত খেয়াল করে যে খাতাটা আসলে তার নয়। সে মিছেই এতগুলো বকা খেয়েছে। তাই সে খানিকটা সাহসে ভর করে বলে স্যার এই খাতাটা তো স্যার আমার না। এক সেকেন্ডের জন্য স্যার হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন কিন্তু ফলাফল সেই একই। এবারও সিফাতই Victim। তবে ভাষাটা একটু অন্য রকম। তোমার কি Common sense কিছুই নেই, আমাকে দিয়ে এতক্ষণ, এতগুলো কথা কেন বলালে, তোমাদের Punishment হওয়া উচিত...।

আরেক বার স্যার হঠাৎ চরম উত্তেজিত হয়ে ইউসুফের রিপোর্ট ছিড়ে ফেললেন। আমরা সবাই তটস্থ। কি ব্যাপার ঘটনা কি। কিন্তু ইউসুফের কোনো বিকার নেই। সে দিব্যি নিশ্চিন্তে Sessional করছে। আস্তে কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম 'কি ব্যাপার রিপোর্ট ছিড়ে ফেলল যে'। ইউসুফ ঢাকাইয়া কুট্টি। খিক খিক করে খানিকটা হেসে জবাব দিল 'আরে আর কইস না Graph paper-এ হুদা দুইটা axis আইকা জমা দিছি তো; তাই হালার মাথাটা গরম হইয়া গেছে।

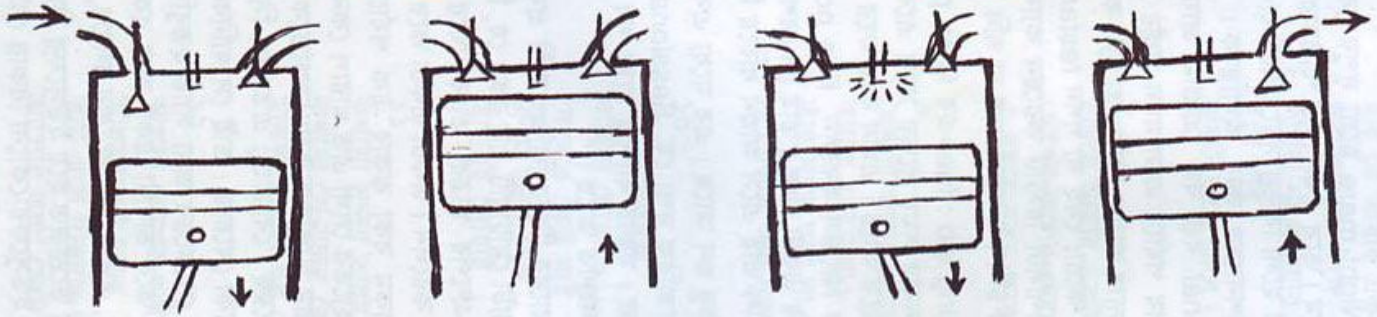

INTERNAL COMBUSTION ENGINE
© ME, BUET
OFFERED COURSES: BRIGHT FUTURE, HIGHLY PAID JOB, MENTAL SATISFACTION.
COMPLETED COURSES: BASH, LAG, CHHEKA, MENTAL DISORDER
LEVEL-1 SUCTION/ NOBIN BORON
LEVEL-2 COMPRESSION/ TOO MANY 4 CREDITS
LEVEL-3 POWER/ PROJECT, SESSIONALS
LEVEL-4 EXHAUST/ RAG
MAMUR
2006

'কখন কোথায় কিভাবে' কিছু স্মৃতি থেকে যায় মনে

কল্লোল দাস, ব্যাচ '০১

মেকানিক্যাল ডে '০৫ উপলক্ষে নির্মিত ও প্রচারিত সিনেমা 'কখন কোথায় কিভাবে' সম্পর্কে আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন অথবা দেখেছেন। সেই সিনেমারই পর্দার পিছনের গল্পের অবতারণা করতেই আমার আজকের প্রয়াস।

তখন আমি পড়ি ৩/১-এ। সামনে মেকানিক্যাল ডে। শুনলাম বাপ্পি ভাই একটা সিনেমার স্ক্রিপ্ট লিখছেন। এখন একজন Editor লাগবে। গত মেকানিক্যাল ডে-এর সিনেমা দেখে আমারও খুব ইচ্ছা হয়েছিল ভাইয়াদের মতো আমিও সিনেমা Editing করব। বাপ্পি ভাইকে বললাম, আমি অল্প-স্বল্প পারি। বাপ্পি ভাই যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। তখন থেকে শুরু হলো সিনেমার গল্প।

বাপ্পি ভাই প্রথম ২/১ টা দৃশ্য আমাদের পড়ে শোনালেন। আমরা অভিভূত। এরপর হলো Casting, তারপর একজন ক্যামেরাম্যান ঠিক করা হলো আর একটা শুভ দিন ঠিক করা হলো। আমাদের সিনেমার শুটিং শুরু হবে। আমরা সবাই মোটামুটি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি কবে সেই দিন আসে। আমার উৎসাহ একটু বেশি। আমাকে দেওয়া হয়েছে সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব। সিনেমার কিছুই জানি না, শুধুই দেখতে ভালোবাসি। কিন্তু এতো বিশাল দায়িত্ব কাঁধে।

যাই হোক প্রথম দিন আমরা সবাই সকালে বুয়েটে ক্যাফের সামনে হাজির। আমি প্রথমে এসে দেখি সবার মুখ কালো। কেমন যেন চুপ করে বসে আছে সবাই। কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু সামনে যেতেই একজন এগিয়ে এসে বলল, 'ভাইয়া আমাদের সিনেমা হবে না। আমাদের নায়ক নেই।'

কি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না। পরে শুনলাম মাশফিক ভাই হঠাৎ একটা জরুরি কাজে আটকা পড়ে গেছেন। একদমই সময় দিতে পারবেন না। কি করা যায় ? চারদিকে চলছে নায়কের খোঁজ। একটু পরে আরো একজনের কাছে শুনলাম রাব্বিকে বলা হয়েছে নায়ক হবার জন্য। কিন্তু রাব্বি তখন চট্টগ্রাম। রাব্বি হয়তো কালকে আসতে পারবে ঢাকায়। রাব্বি প্রথম রাজি হতে চায়নি, কিন্তু প্রতনুর একটি বিখ্যাত কথা 'রাব্বি, এর পরে তোকে আমাদের অনুরোধ করা ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকবে না '। এরপর রাব্বি আর না বলতে পারে নি। (Thanks to Pratunu)

যাই হোক সেদিনের পরিকল্পনা পরিবর্তন করে শুধুমাত্র নায়ক যেখানে নেই সেসব দৃশ্যের শ্যুটিং শুরু হলো। সবাই প্রথম কোনো সিনেমায় অভিনয় করছি। একের পর এক ভুলত্রুটি হচ্ছে। ক্যামেরাম্যান (তারু ভাই) প্রফেশনাল। কিন্তু উনিও খুবই মজা পাচ্ছেন। সবাই ঝড়ের গতিতে কোনো রকমে ডায়ালগ বলে শেষ করতে পারলে বাঁচে। আর কথা বলা শেষ হবার সাথে সাথেই সবাই একবার করে ক্যামেরার দিকে তাকাচ্ছে। মাঝে মাঝে মাইক্রোফোন ক্যামেরা চলে আসছে। শব্দ আসছে না ঠিকমতো। কিন্তু কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। কারোরই উৎসাহের সীমা নেই, নতুন অভিজ্ঞতা।

একটু পরে হলে গেলাম। সেখানে প্রথম দৃশ্যের শুটিং হবে। বাপ্পি ভাইকে মাথা ঘুরে পড়ে যেতে দেখা যাবে। প্রতনুকে দেখা যাবে বাপ্পি ভাইয়ের হাত ধরে টানছে। বাপ্পি ভাইকে ৩/৪ বার পড়তে হলো। শেষ পর্যন্ত বাপ্পি ভাই পর্যন্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, 'এটাই শেষ। আমি আর পড়তে পারব না।'

এরপরে ইএমই তে,বাপ্পি ভাইকে একটি চেয়ার নিয়ে পড়ে যেতে হবে। ইএমই- তে একটি চেয়ার পাওয়া গেল যার একটি পায়া ভাঙ্গা। ভাঙ্গা পায়া, ভাঙ্গা চেয়ার এবং বাপ্পি ভাইসহ শট নেওয়া হলো।

ওএবি-তে একটি ক্লাস-এর দৃশ্যে পিছনে একজনকে দেখা যাবে যে সব সময় ঘুমাবে। মামুরকে দেওয়া হলো এই দায়িত্বে। আমরা ক্লাসের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরেই শুটিং করলাম। শুটিং শেষে বের হয়ে আসার সময় দেখা গেল মামুর সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে আছে।

সাগর হচ্ছে পাতি মাস্তান। মাস্তানদের প্রথম দৃশ্যে একজন লিডার (শরিফভাই) সাগরকে চড় মারবে। প্রথম Take-এ শরিফ ভাইয়ের Measurement ঠিক ছিল না। তাই চড়টা সত্যি সত্যি হয়ে গেল। ক্যামেরায় শব্দও শোনা গেল। এরপর আরও তিনবার Take নেওয়া হলো। কিন্তু পরে রাখা হয়েছিল প্রথমটাই। (সাগর এজন্য আমার উপর খুব রেগে আছে)।

এরপর আরেকটি দৃশ্যে সাগরকে হলের একটি দরজায় ধাক্কা দিতে হবে। আবারও Measurement-এ সমস্যা। ধাক্কা দিতে গিয়ে সাগর সত্যি সত্যি ব্যাথা পেল তার হাতে। আর আমরা পেলাম জীবন্ত কিছু দৃশ্য।

রাব্বির শেষ দৃশ্যে একটি ডায়ালগ হচ্ছে, 'আমার হাতে রঙ লেগেছিল, ওরা দেখে ভেবেছে রক্ত।' এটা মনে হয় ১০/১১ বার নেওয়া হয়েছে। রাব্বির প্রত্যেকবারই একই কথা, 'আমার হাতে রক্ত লেগেছিল, ওরা ভেবেছে রঙ'।

শুটিং ভালোমতেই এগোচ্ছে। সব দৃশ্যের ধারণই মোটামুটি শেষ। শুধু প্রথম দিকে কিছু দৃশ্য যাবে সেগুলো বাকি। এর মাঝে শুরু হলো রাজনৈতিক অস্থিরতা। আপাতত কয়েকদিন হরতাল এবং কাজ বন্ধ। হরতাল শেষ হলো। আরেকটি দুঃসংবাদ, আমাদের ক্যামেরাম্যান accident করেছেন, উনি হাসপাতালে। কাজ আবারও বন্ধ হয়ে থাকল।

অবশেষে শুরু হলো Editing -এর পালা। আমরা একটি Editing House-এ গেলাম। সেটার মালিক শরীফ ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন আমরা কি বানাচ্ছি। বললাম একটা সিনেমা। আমাদের স্ক্রিপ্ট শুনে উনি বললেন, 'এটা তো সিনেমা না। এটাকে নাটক বলা যেতে পারে।' আমি আর বাপ্পি ভাই ছিলাম সেখানে। আমাদের মন খুবই খারাপ হয়ে গেল। এতদিন সিনেমা-সিনেমা বলে আসছি এখন শুনি এটা একটা নাটক। আমরা উনাকে বুঝানোর চেষ্টা করলাম সিনেমা না হলেও এটা তো একটা স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র হতে পারে। কিন্তু উনি কিছুতেই মানতে রাজি নন। শেষ পর্যন্ত উনার সামনে আমরা এটাকে নাটক বলেই মেনে নিলাম।

এরপর Editing-এর জন্য সময় পাওয়া নিয়ে শুরু হলো সমস্যা। [illegible]াল Editing House। তাই তারা সব সময় ব্যস্ত। বাপ্পি ভাই একদিন আমাকে ফোন করে জানালেন, 'সুখবর, সময় পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার রাত ১১টা থেকে ভোর ৭টা।' আমার তো মাথায় হাত। সারারাত জেগে থাকতে হবে। যাই হোক; এরপরে আরও একদিন আমাদের সারা রাত জেগে থাকতে হয়েছিল।

Editing শুরু হলো। প্রথমেই সমস্যা। কোন ক্যাসেটে কিসের শট নেওয়া হয়েছে কিছুই মনে নেই। শুরু হলো খোঁজাখুজি। কোনো রকমে সব কিছু আলাদা করা হলো। তারপর দেখা গেল, একটি দৃশ্যের শুটিং করা হয়নি আর একটি জায়গায় ডায়ালগ নেওয়া হয়নি। আবার মাথায় হাত। আবার শুটিং করা সম্ভব নয়। তাই দুইটা দৃশ্যকে একটা দৃশ্য বানানো হলো। থেকে গেল ডায়ালগের সমস্যা। জুলি আপুকে দিয়ে ডায়ালগ দেওয়া হলো কম্পার ('আমাকে হলে যেতে হবে এক্ষুণি')।

এরপর একটি জায়গায় প্রতনুর ডায়ালগ বলার কথা মেয়েদের দিকে তাকিয়ে, 'দেখ দেখ, তোর নায়িকা তো চলে যাচ্ছে।' প্রতনু ডায়ালগ দিয়েছে উল্টা দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি আসল। ছবিটাকে Mirror করে দেওয়া হলো। প্রতনুর বামগালে ছিল তিল। সিনেমায় ঐ দৃশ্যে ওটা চলে গেল ডান গালে।

Editing চলছে। সবার হাত, পা, চোখ, মুখ মেলাতে হচ্ছে। একেক জন একই কথা তিনবার তিন রকমভাবে বলেছে। কোনটা রেখে কোনটা কাটি। প্রতিটা দৃশ্য ১০/১২ বার করে দেখতে হচ্ছে। সবার চেহারা আস্তে আস্তে অসহ্যকর হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছিল, সামনে দেখতে পেলে হয়তো মারও দিয়ে বসতে পারি। একটা জায়গায় দেখা গেল Microphone চলে এসেছে ছবিতে। ছবিটা জুম করা

হলো। মাইক্রোফোন গায়েব হয়ে গেল। আরেকটা জায়গায় তাহসিনের হাসি আমাদের কিছুটা আনন্দ দিল। তাহসিনের হাসির শট নেওয়া হয়েছে ৮ বার। আর মানুষ জোর করে হাসলে যে কেমন লাগতে পারে সেটা বুঝলাম তাহসিনের ৮ বার ৮ রকমের হাসি দেখে।

মাস্তানদের একটি দৃশ্যে মাস্তানরা প্রতনু আর বাপ্পি ভাইকে বলবে, 'তোরা দৌড়া'। এ সময় পিছনে রাব্বিকে দেখতে পাবার কথা না। কিন্তু ক্যামেরায় রাব্বি চলে এসেছে। শুধু তাই নয়, আমাদের নায়ক কোমরে হাত দিয়ে আরেক হাত Railing-এ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের হাত পা বাঁধা। আর কোনো শট ছিল না।

শুটিংয়ের সময় আমাদের সবারই মোটামুটি মাথা গরম অবস্থা ছিল। Editing-এর সময় একবার দেখি মারিয়া বলছে, 'এরা যে কখন Cut বলে, আর কখন Action বলে কিছুই বুঝি না।'

সিনেমার গানের একটি দৃশ্যে 'কখন কোথায় মন কিভাবে' রাব্বিকে দেখা যায় একটি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। ছবিতে রাব্বির পিছনের দিক আর আয়নাতে রাব্বির মুখ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু রাব্বি আয়নার সামনে দাঁড়ালে এই ছবিটা আসছিল না। তাই রাব্বিকে দাঁড়াতে হলো দেয়ালের সামনে। যদিও দেখে মনে হবে রাব্বি আয়নাতে দেখে চুল আঁচড়াচ্ছে।

টানা ৩দিন Editing করার পর আমার অবস্থা খুবই কাহিল। রাতে ঘুমানোর পর স্বপ্ন দেখছি, হঠাৎ মনে হলো 'এই দৃশ্যের পর তো এই দৃশ্য আসার কথা নয়। ঠিকমতো Synchronize হলো না।' দৃশ্যটা আমাকে আবার দেখতে হলো। একই স্বপ্নে একই দৃশ্য ৩ বার দেখতে হলো আমাকে। কি Pathetic!

যাই হোক, শেষ হলো Editing। মাশফিক ভাইয়ের তৈরি Music Track বসানো হলো। গান গাইলেন মাশফিক ভাই, জুলি আপু আর বাপ্পি ভাই। Music Composition-এ যথারীতি মাশফিক ভাই।

না, ঝামেলা শেষ হয়নি এখনো। সিনেমা ডিভিডি- তে নিতে হবে, কিন্তু যেখানে Editing করেছি সেখানে ডিভিডি রাইটার নেই। আবার খোঁজাখুঁজি। অবশেষে মেকানিক্যাল ডে-এর আগের দিন সন্ধ্যায় হাতে পেলাম সিনেমার ডিভিডি। বাকী অংশ সম্পর্কে আপনারা নিশ্চয়ই অবগত।

একটি চিহ্ন রেখে গেলাম

মোঃ রাশেদুল ইসলাম (রাসেল), # ০০১০০৯২

২০০৩ সালের অক্টোবরের এক বিকেলে হঠাৎ করে টের পেলাম মাশীদ আপু ('৯৭ ব্যাচ) কথায় কথায় আমাকে যন্ত্রকৌশল সংসদের সক্রিয় সদস্য করে ফেলেছেন। যদিও পুরো বুয়েট জীবনটাই আমার কেটেছে অত্যন্ত আনন্দের মাঝে। তারপরও মাঝের ক'টা দিন মেকানিক্যাল এসোসিয়েশন আমার কাছে হয়ে উঠেছিল স্বপ্নের এক জগৎ।

মেকানিক্যাল এসোসিয়েশন আমাকে কতটা দিয়েছে আর আমি কতটুকু দেবার চেষ্টা করেছি তা লিখতে যাওয়াটা খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কারও নাম উল্লেখ করার ঝুঁকিটাও আমি নিতে চাইনি। কারণ, এক্ষেত্রে প্রায়শঃ দেখা যায় আমি অতি গুরুত্বপূর্ণ কারো কথা ভুলে যাই। তবে চারটি নাম উল্লেখ করাটা অত্যাবশক মনে করছি। জাকী স্যার, মাশীদ আপু, সুবর্ণা আপু এবং জিয়া ভাই। সম্ভবতঃ তাদের অজান্তেই তাদের বলা ছোট কিছু কথা আমার আত্মবিশ্বাসের মজ্জাকে করেছে সমৃদ্ধ।

আজ থেকে অনেকগুলো বছর পরে অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং অতুলনীয় এক সংগঠনের অত্যন্ত সমৃদ্ধ সংগ্রহশালার ছোট্ট এক প্রকাশনায় আমার এই ছোট্ট লেখাটা খুঁজে পাবো, এটাই আশা।

জীবনের স্বাদ

মাশীদ

রিপোর্ট কার্ডে যখন দেখি পাঁচ বিষয়ে ফেল,
কিংবা যখন দাম বেড়ে যায় গ্যাস-জ্বালানি তেল,
রিকশা-গাড়ি-ভলভো এবং সিএনজি-ট্রাক দিয়ে
ট্র্যাফিক জ্যামে থাকার সময় মাথায় কাকের 'ইয়ে',
কিংবা যখন ম্যানহোলেরই গভীর তলে ডুব-
এসব সময় সাধের জীবন তিক্ত লাগে খুব।

পাওনা টাকা চাইতে হঠাৎ কেউ যদি বা আসে,
কিংবা যখন সুইটি বলে, 'আর রব না পাশে',
মা-বউ-এরই ঝগড়া শেষে সাপোর্ট দিলে মা'কে,
হায় কি দারুণ মধুর নামেই বউ আমাকে ডাকে!
বাবার ঝাড়ি খেয়ে কোনো প্ল্যান যদি বানচাল-
সেসব সময় বলছি শোন জীবন ভীষণ ঝাল।

বেড়েই চলে মিটার যখন কাল-হলুদ ক্যাবে,
সকাল-বিকাল ক্লাস করে যাই থিওরি আর ল্যাবে,
ন'টা-পাঁচটা অফিস যখন আজকে এবং কাল-ও-
জীবনটা খুব পানসে লাগে, আর লাগে না ভাল।

ঝাঁঝালো খুব লাগবে জীবন ঈদের বাজার শেষে–
বক্তৃতা আর সভা-মিছিল-গণসমাবেশে।

ঝড়ের দিনে আম কুড়ানো, মেলায় আচার খাওয়া–
এদের মাঝে যাবে খুঁজে টকের ছোঁয়া পাওয়া।

আবার নতুন বছর এলে নতুন পাখির গানে
নতুন কোনো প্রেমপত্র আমায় কাছে টানে,
এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়ে বেকার এ জীবনে
থাকি যখন ভালোবাসার মধুর আলিঙ্গনে,
কিংবা যখন সুন্দরবন, কক্সবাজারের বীচে
মেতে উঠি সবাই মিলে এক আকাশের নীচে,
যখন দেখি মায়ের কোলে শিশুর মুখে হাসি–
জীবনটা খুব মিষ্টি লাগে, আহ! কী ভালোবাসি!

এই জীবনের কোথাও উঁচু, কোথাও গভীর খাদ,
এসব নিয়েই পাঁচমিশালী এই জীবনের স্বাদ।

অতঃপর

শাফায়েত খুরশীদ (ফাহাদ)
০২১০০৯২

রাতের তারার মৃদু ঝিলিক
কিংবা ভোরের নিঃশব্দ নিশ্বাস
শরতের মহিমায় শুভ্র কাঁশফুল–
কিংবা জলাধারের নীলে ধূসর বালিহাঁস।
আকাশমনির হলুদাভ ফুল
ত্রি-চক্রযানের টুংটাং রিনিঝিনি
সবই থাকে একপাশ...।
অপরপাশ...
উত্তপ্ত মরুতে বালুঝড়,
হৃদয় পুড়ে বিষাক্ত সিগারেটের মতো।
ব্যস্ত কঠোর কৃপণ সময়–
অন্য আনন্দের আতিশয্য;
সবই অসহনীয় অসহ্য।
জীবন কখনও চলে না সমান্তরাল;
স্বপ্নের প্রতিবিম্বের অন্যপাশে
এক দীর্ঘশ্বাস।

প্রাক্তন

শামস
০২১০০৩৮

আমার চোখে আমার জীবন ছিল স্বপ্নময়
রঙিন জীবন সুতোয় বেধে ধূসর জীবন হয়।
স্বপ্ন পথের অসীমতায় স্বপ্নের শেষ নাই
স্মৃতির পাতা বন্ধ তাতে ধুলোবালির ঠাঁই।
মাতিয়ে রাখা দিনগুলো ঠিক মদ্যপানের নেশা
বাস্তবতার মাতন দোলায়, কল্পনাহীন মেশা।
আড্ডা আর তাসের ভীড়ে, ব্যস্ত গতির ছোঁয়া
ব্যস্ততা আজ বাড়ল তবু সে সব কিছুই ধোঁয়া।
বন্ধু আর ভালবাসায় পূর্ণ ছিল সবি
আজ সে সবি ক্লান্ত হাসি, দীর্ঘশ্বাসের ছবি।
মধ্যরাতের আসরগুলোর উচ্চস্বরের ধ্বনি
বিম্বটা আজ ভাঙছে কানে, স্মৃতির প্রতিধ্বনি।
পেছন সারির বসে থাকা উচ্ছল সেই জীবন
হয়ত আজো পেছন সারির, নয় তো কিছুই আপন।
হারিয়ে যাওয়া জীবন যে আজ কল্পনারই রায়
যান্ত্রিকতার যন্ত্রনাতে বিদ্ধ জীবন হায়।

সার্থকতা

মোঃ রিফাত আব্দুল্লাহ
#০২১০০১৭

এখানে শুধুই গহীন আঁধার, যায় না কিছুই দেখা
বন্দী জীবন পেরিয়ে শুধুই মুক্তির আকুলতা।
নয়-দশ মাস আটকে থেকে ভীষণ ব্যাকুলতায়
হাত দুটো হয় মুষ্টিবদ্ধ, মুক্তির আকুলতায়।
তারপর যখন মুক্তি মেলে মায়ের যাতনায়
শিশু কেঁদে বুকটা ফাটায়, আগমনী ঘোষণায়।
শৈশবে তার চোখটা খোলা, হৃদয় কপাট বন্ধ
নয়ন ভরে ভুবন দেখে মনের আঁখি অন্ধ।
বাল্যকালে নিয়ে হাতে, চিরুনী আর আয়না
ছোট ছোট দুষ্টুমি আর মায়ের কাছে বায়না।
কৈশোরটা ভীষণ ভালো, চোখে রঙিন চশমা
আকাশকুসুম কল্পনা সে, নয়তো সত্যি হবার।
তারুণ্যটুকু কেটে যায় জীবনকে গড়তে,
সমাজ, পরিবেশ আর বাস্তবতার সাথে লড়তে।
যৌবনতো ভীষণ সময়, সারা জীবনের জুয়া
জীবন সঙ্গী বাছাই করে সংসার গড়ে নেয়া।
এমনি করেই জীবনটা যায় ছোট খাটো ভালোবাসায়
টুকিটাকি সুখ দুঃখ আর আগামীর ভরসায়।
এবার যখন বিদায়ের শেষ ঘণ্টা বেজে যায়
মায়ের পেটের গহীন আঁধার মনে পড়ে যায়।
অতীতটা শুধু বারবার চোখে ভেসে ওঠে,
হৃদয় কেবল নিজের কাছে একটি প্রশ্নই রাখে।
আঁধার থেকে এসে যখন আঁধারেই ফিরে যাওয়া
মাঝের সময়টা থেকে কতটুকুই বা পাওয়া ?
জবাব আছে বুকের ভেতর; খুঁজলে পাওয়া যাবে
খোঁজার মতো খুঁজতে হবে সময় ফুরোবার আগে
অন্ধকারে জন্ম জার, আঁধারই পরিসর,
তার মাঝেই জন্ম নেবে আলোর কারিগর।
জীবন মানে নয়তো শুধুই অন্ধকারের ছড়া
অর্থহীন এই জীবনটাকে অর্থবহ করা।

বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি

মুহম্মদ মাহের নূর, #০২১০০৮২

বুয়েট ক্যাফের সামনে বৃষস্কন্ধ তাগড়া জোয়ান ঘাড়ে গর্দানে ঠাসা জামসেদ যেদিন রোগা পটকা শওকত কে ধরে বেদম পেটালো সেদিন শওকত বাসায় ফিরে চোয়ালে বরফ ঠেসে ধরে প্রথম উপলব্ধি করল তার ভাগ্য খুবই ভালো ছিল। রাগে হিতাহিত জ্ঞান না থাকায় জামসেদ ঘুষিগুলো তাকমতো বসাতে পারেনি। হাতির পায়ের সাইজ ওই হাতের একটা ঘুষি ঠিকমতো পড়লে শওকত তিন হাত মাটির নিচে থাকত। বেশিরভাগ দোষ ওই ওভার সাইজ বুনো শুয়োরটার, কিন্তু শওকত এই ভেবে স্বান্তনা পেল, 'ভাগ্যিস নাকটা ভাঙেনি'। এরকম স্বান্তনা শওকত প্রায়ই নিজেকে নিজে দিয়ে থাকে।

সরু কাঁধের উপর বসানো বিরাট একটা মাথার কারণে শওকত যতটা লম্বা তাকে ততটা লম্বা দেখায় না। সেই ছোটবেলা থেকে সব ধরনের খেলায় 'দুধভাত' শওকত পারার মতো করে কিছুই পারে না। পারলেও সেসব কেমন খাপছাড়া হয়ে যাচ্ছে। যেমন সেদিন ক্লাস টেস্টে বিশে ছয় পেয়ে সে স্যারের কাছে গেল খাতা দেখতে, নিশ্চিত জানে অন্তত আঠারো পাবার কথা। স্যার ধীরে সুস্থে খাতা বের করলেন, এক ঝলক দেখে বললেন, 'তুমি সূত্র লিখে তারপরই উত্তর লিখেছ কেন ?' শওকত খুবই বিনয়ের সাথে স্বীকার করল সময় স্বল্পতার কারণে সে অঙ্কটা ক্যালকুলেটরে করেছিল। স্যারের সরল প্রতিউত্তর, 'তুমি নিজে ক্যালকুলেশন করেছ আমি কিভাবে নিশ্চিত হবো ?' বুয়েটে তৃতীয় বর্ষে এ ধরনের কথা শুনতে হবে শওকত স্বপ্নেও ভাবেনি। যে কড়া গার্ডে পরীক্ষা হয় তাতে তো ঘাড়ও ফেরানো যায় না। আর যে ছাত্র সূত্র লিখে তা ক্যালকুলেটরে সমাধান করতে অপারগ বুয়েট ভর্তি পরীক্ষা দেবার পর সে আর বুয়েটে ফেরত আসেনি। কিন্তু সমস্যা হলো ভিন্ন ডিপার্টমেন্টের স্যারদের এত কথা বলা সম্ভব না; কোনো এক অবোধ্য কারণে মেকানিক্যাল সবার চক্ষুশূল। ফিরে আসার পথে শওকত নিজেকে স্বান্তনা দিল, 'যাই হোক, অঙ্কটাতো আমি পারি।'

বিগত কয়েক বছর হলো শওকতের কাছে পৃথিবী খুবই বেঢপ মনে হচ্ছে। যদিও পৃথিবী চিরকালই বেঢপ। দোষ পৃথিবীর না, দোষ মানুষের। সেই আদি যুগে মহাপ্রভু আল্লাহ যখন আকাশ থেকে 'মান্না সালওয়া' বর্ষণ করতেন তখনও মানুষ ত্যাঁদড়ামি ছাড়তে পারেনি। সুতরাং, এই মঙ্গার যুগে মানুষ যে আরো বেশি ত্যাঁদোড় হবে তা স্বাভাবিক। তবে ঠিক কতখানি ত্যাঁদোড় শওকত সেটা মোটামুটি টের পেল বন্ধুর বড় বোনের বিয়ের অনুষ্ঠানে ভরপেট খেয়ে ফেরার পথে। ছয়জনের একটা দল তার রিকশা থামাল, পোশাক পরিচ্ছদ দেখে মনে হতে পারে ডিজুস বিজ্ঞাপনের মডেল তারা। তাদের মাঝে শুকনা মতো একজন খুবই শান্তস্বরে কুশলাদি জানতে চাইল, 'ভাই, ভালো আছেন ?' আতঙ্কে গলা শুকনো, শওকত বার দুয়েক ঢোক গিলে কিছু বলবে, তার আগেই সেই ছেলে চিড়বিড় করে ওঠে, 'আমি যে তোর কাছে দশ হাজার টাকা পাই সেটা কবে ফেরত দিবি ?' ওদের কোনোভাবেই বোঝানো গেল না শওকত সেই দশ হাজার টাকার ব্যাপারে কিছু জানে না। শওকতের হয়ে ঋণ শোধ করল তার অতি প্রিয় মোবাইল সেট, পকেটের তিনশ বিরাশি টাকা, আর মাঝারি দামের হাতঘড়ি। মিন মিন করে শওকতের শেষ চেষ্টা ছিল, 'ভাই, সিমটা দিয়ে যান; ওটাতে আপনাদের কোনো কাজে আসবে না।' এবার ছয় জনের মধ্যে যার স্বাস্থ্য সবচেয়ে গোছালো সে কষে একটা চড় বসিয়ে হিস হিস করে ওঠে, 'উপদেশ দিবি না। আল্লাহরে শুকুর কর তরে জানে মারি নাই।'

লুণ্ঠনকারীর মুখে আল্লাহর নাম শুনে শওকত অভিভুত হয়ে গেল। যে দেশের সিংহভাগ মুসলমান এক শুক্রবার ছাড়া মসজিদের দরজা চেনে না সে দেশের একজন ছিনতাইকারী কার্যক্ষেত্রে আল্লাহকে ভুলে নাই– এটা যে কত বড় স্বান্তনার বিষয় তা গাঢ়ভাবে উপলব্ধি করে বাড়ির পথ ধরল শওকত। সাথে

ঘড়ি, টাকা, মোবাইল কিছুই না থাকায় নিজেকে মনে হচ্ছিল সভ্যতা বিচ্যুত গৃহ বিবাগী সুখী পুরুষ। সেই অনাবিল প্রশান্ত মুহূর্তে জগতের সকল কিছু হতে সাময়িক ছুটি নেবার সাথে সাথে শওকত আবিষ্কার করল গুরুতর একটা সত্য– সেই চড় মারা ছেলেটা আল্লাহর নাম নিল ঠিকই, কিন্তু আল্লাহকে স্মরণ করে নাই। আমরা মুসলমানরা বেশিরভাগই এরকম, আমরা তাঁকে স্মরণ করি না। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে, প্রতিপাশে তিনি খুবই স্পষ্টভাবে বিরাজমান, কিন্তু আমরা নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত, অসংখ্য হিসাব-নিকাশ আর বেহুদা কাজের ভিড়ে আমরা তাঁকে দেখতে পাই না। তিনি গভীর ভালোবাসা নিয়ে আমাদের কাছে ডাকছেন, আমরা তা শুনতে পাই না।

তিনি বলছেন তোমাদের সব সমস্যার সমাধান আমি করব, আমার মতো বন্ধু কোথাও পাবে না, আর আমরা তাঁর সম্পর্কে চিন্তা করার কথাও চিন্তা করে দেখছি না।

এতসব দার্শনিক চিন্তা ভাবনায় বিগলিত হয়ে শওকত যখন বাসায় ফিরল তখন সে আশা করেছিল সবার সহানুভূতি পাবে। প্রথমে সবাই খুব হুড়মুড় করে ছুটে এল, কিন্তু যখন দেখল শওকত অক্ষত তখন সবাই একবাক্যে বলল দোষ তারই। এত রাতে বিয়ের দাওয়াতে সে কেন গেল ? মোবাইল থাকলেই যেখানে সেখানে নিয়ে যেতে হবে ? সুযোগ দিলে ছিনতাই তো হবেই। বেশুমার উপদেশবাণীর মাঝে বাবা পরোক্ষভাবে এটাও জানিয়ে দিলেন সহসা নতুন মোবাইল কিনে দেবার মতো মানসিকতা তাঁর মাঝে বিরাজ করছে না। রাতে দাওয়াত খেতে যাবার অপরাধের ব্যাপারে সবার মতামতের এমন সুষম অভিন্নতা দেখে শওকত মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিল, 'ভ্যাগিস চড় খাবার কথাটা বলিনি, তখন আবার কি মতামত শুনতে হতো কে জানে।'

কেননা, আজকাল যে কোনো বিষয়ে জনতার মতামত অতি বিচিত্র। জনপ্রিয় দৈনিক 'প্রথম আলো'র সাথে শনিবার প্রকাশ পায় 'ছুটির দিনে'। সেখানে পাঠক জরিপে দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ রচিত সেরা কবিতা নির্বাচিত সেই চিরচেনা 'আমাদের ছোট নদী...'। মানুষ কি পাঠ্য বই ব্যতিত রবীন্দ্রনাথ পড়ে না ? কবি গুরুর সেরা কাব্য এটাই ? কি দূর্দান্ত মতামত! আমাদের সৌভাগ্য কবিগুরু মৃত, নয়তো তিনি কি মন্তব্য করতেন কে জানে। আবার তিনি বেঁচে থাকলে এখন হয়তো ডিজুস পরিভাষায় মোবাইলে কাব্য লিখতেন। যে কোনোদিন এই নিম্ন শ্রেণীর রুচিহীন ভাষায় সাহিত্য কর্ম বের হয়ে যেতে পারে। বাংলা সাহিত্য অনেক এগিয়ে যাবে সন্দেহ নাই। এখনতো টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ছোট ছোট লাইনে ভেঙে সাজিয়ে লিখে দিলেও কবিতা হয়ে যায়। এই যুগেও কবিগুরুর কবিতা পাঠ্য বইয়ে স্থান পায়– এটা অবশ্যই সান্ত্বনার ব্যাপার।

সুরাইয়া প্রায়ই বলে, 'আচ্ছা শওকত, তুই এত পেইন কেন ?' প্রথমবার শওকত বোঝেনি সুরাইয়া কি বলতে চায়। শওকত নিজে পেইন, নাকি শওকতের পেইন নিয়ে কথা হচ্ছে ? পরে সুরাইয়া ব্যাখ্যা করল শওকত তার আশেপাশের সবার জন্য মুর্তিমান পেইন। 'কাহার প্রেমের বেদনায় আমার মূল্য আছে...'-এই পংক্তির বেদনা নয়, এই পেইন মানে বিরক্তি। শওকত প্রতিবাদ করেনি, সুরাইয়ার বেশিরভাগ কথারই সে প্রতিবাদ করে না, আর এটাতো বাস্তব সত্য। আমাদের দেশে যারা সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে আছে তাদের বেশির ভাগ অন্য দুটো নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু শওকতকে বাধ্য হয়ে বিজ্ঞান পড়তে হয়, বুঝুক আর নাই বুঝুক; আনন্দের আশায় সে সাহিত্য পড়ার চেষ্টা করে, আল্লাহর ভয়ে সে ধর্ম গ্রন্থের পাতা উল্টায়। বলা বাহুল্য তিনটার একটাও সে পারে না। বরং বল যেমন পক্ষ-প্রতিপক্ষের আঘাত-প্রত্যাঘাতে দিশেহারা হয়ে মাঠময় দৌড়ায়, তেমন এই তিনের মাঝে শওকত ছুটাছুটি করে। সাহিত্যে ঝোঁক থাকায় ধর্মওয়ালারা তাকে আদর করে ডাকে 'ছোট মুরতাদ', সাহিত্য সভায় সে 'বাংলা ভাই' আর বুয়েটে সে আঁতেল। সাধারণভাবে সে সবার বিরক্তি। তিনদলের কেউ তাকে নিজেদের লোক মনে করে না। তবে শওকতের স্বান্তনার বিষয় এই যে, সবাই ভাবে সে অন্য দলভূক্ত। এভাবে পরোক্ষভাবে হলেও সে কোনো একটা শ্রেণীতে পড়ে। এটাও অনেক বড় ব্যাপার।

কিছু একটা ঠিকমতো হচ্ছে না, কোথাও সামান্য হলেও অসংলগ্নতা আছে। নয়তো সবকিছুই এমন তালগোল পাকিয়ে যাবার কথা না। অল্প একটু বৈসাদৃশ্যের কারণে পুরো ছবিটা ঘোলাটে লাগছে।

শওকত প্রাণ পনে বিশ্বাস করে জীবন জিনিসটা খুবই সুন্দর– নিজের কোন একটা কমতির জন্য সে জীবনের মূল সুরটা ধরতে পারছে না। বারবার তাল কেটে যাচ্ছে। তার তো সব কিছুই আছে, তবু মনে হয় কিছুই যেন নেই। এই ঘোর অতৃপ্তির উৎস কোথায় ? নিজের জন্য বরাদ্দ জগতের এই সামান্য কিছু সময় কি এরকম ক্ষোভাকূল হৃদয় নিয়ে কাটতে হবে ? সমাধান না পেলেও সমস্যাটুকু বুঝতে পারছে– এটা অবশ্য শওকত কে বেশ স্বান্তনা দেয়। সুরাইয়া এসব শোনে আর মুচকি মুচকি হাসে। তার ব্যাকুলতা তার সবচেয়ে কাছের বন্ধুর কৌতুকের খোরাক এটা ভেবে শওকত কিছুটা গম্ভীর হয়ে যায়। সুরাইয়া তখন শব্দ করে হাসে। শওকতের চোখে পানি চলে আসার মতো অবস্থা হয়। সে রুদ্ধ স্বরে প্রশ্ন করে, 'হাসিস কেন ?' সুরাইয়া মুখে হাত চাপা দেয়, হাসির দমকে হাঁপিয়ে উঠে। শওকত বিতৃষ্ণায় অন্যদিকে ফেরে। সুরাইয়া হাসতে হাসতেই বলে, 'তুই যখন এসব ফালতু ইমোশনের কথাবার্তা বলিস তোর দাড়িগুলো খুব অদ্ভুতভাবে নড়াচড়া করে, ওগুলো দেখে হাসি, রাগ করিস না।'

তারপর তেরছা করে তাকিয়ে ওড়না ঠিক করতে করতে খুব স্বাভাবিক গলায় বলে, 'আমার একটু নিউমার্কেট যেতে হবে, যাবি আমার সাথে ?' সেদিন নিউমার্কেট হতে ফেরার পথে তুমুল বৃষ্টি শুরু হলো। সারাদিন ছিল গুমোট ভ্যাপসা গরম, ধরণী উন্মুখ হয়ে সারাটা সময় চেয়েছিল আকাশপানে। শওকত চাচ্ছিল বৃষ্টি হোক। যেন তার ইচ্ছার পূরণেই ব্যাকুল বাতাস মেঘ উড়িয়ে এনে উপহার দিল ঘন বরষা। কিন্তু শওকতের এখন মোটেও ভালো লাগছে না। একা থাকলে একটা কথা ছিল, এখন সুরাইয়া সাথে থাকায় মহা ঝামেলা মনে হচ্ছে। এক দোকানের সামনে সুরু টিনের ছাদের নিচে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুই জন, দুই এক ফোঁটা ময়লা পানি টিনের ফাঁক ফোকর বেয়ে ঘাড়ে মাথায় পড়ছে, যতদূর চোখ যায় একটা রিকশা দেখা যাচ্ছে না। শওকতের শক্ত করে রাখা মুখের দিকে তাকিয়ে সুরাইয়া বলল, 'শোন, আমি একাই যেতে পারব, তুই চলে যা।' শওকত চুপ করে আছে দেখে সেও কিছু সময় চুপ রইল। বৃষ্টির বেগ থেকে থেকে বাড়ছে। এবার সুরাইয়া ফিসফিস করে বলল,

'চল, এর মধ্যে রওনা দেই।'

'সাঁতার দিয়ে যাবি ?'

'আমার ব্যাগে একটা ছাতা আছে।'

'এক ছাতায় দুইজন ? ভিজে যাব তো ?'

'ভিজে যদি অসুখ-বিসুখ করে তাহলে এত সুন্দর একটা মেয়ের সাথে ঘোর বরষায় করেছিনু অবগাহন– এই ভেবে না হয় নিজেকে স্বান্তনা দিবি।'

সুরাইয়ার চোখ দুটি হাসছে, শওকত বিমূঢ় হয়ে যায়, মানুষের চোখ এত গভীর হয়!

ঘোর বরষার আলো আঁধারিতে উঠতি বয়সের দুই যুবক যুবতী ছোট একটা গোলাপী ছাতার নিচে গায়ে গা ঘেঁষে পায়ের গোড়া পর্যন্ত ময়লা পানিতে ডুবিয়ে এলোমেলো ভাবে হেঁটে যাচ্ছে। তাদের মাঝে কোনো ব্যস্ততা নাই, মুখের হাসি দেখে মনে হচ্ছে তারা খুবই আনন্দিত, যেন ময়লা পানিতে পা ডুবিয়ে হাঁটার জন্য তারা এতকাল অপেক্ষায় ছিল। চকিত বিদ্যুতের সাথে সাথে মেঘের গর্জন, বাতাসের বেগ, বৃষ্টির চিরচেনা একটানা শব্দ, মাটির সোঁদা ঘ্রাণ, শ্যামল বৃক্ষরাজির আকুল আন্দোলন, স্বচ্ছ শীতল জলাধার– সবার সম্মিলিত প্রয়াসে তাদের সকল ক্লেদ দূরীভূত হচ্ছে। বারিধারা ঝরছে ঝরছে, সকল অবসাদ দূরীভূত হচ্ছে, মৃতপ্রায় চারাগাছ সবুজ হয়ে উঠছে, চারিপাশের এই অসামান্য প্রাণের উৎসবে পরিপূর্ণতার আনন্দে অংশ নিতে পেরে এই দুই ক্ষুদ্র মানব সন্তান কৃতজ্ঞ হয়ে পথ চলছে। বহুকালের রুদ্ধ বেদনা শত সহস্র জল কণায় বিচ্ছুরিত হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে অপার আনন্দধারায়।

যন্ত্রকৌশল সংসদ